জগন্নাথ ইউনিভার্সিটি জার্নাল অব আর্টস
ভলিউম-১৩, সংখ্যা-২, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২৩

পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের আন্তঃসম্পর্ক: অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক চক্রের মিথস্ক্রিয়া

তারিক হোসেন খান*

Abstract

Capitalism and democracy are philosophically different. The first produces and expands societal inequality, while democracy promotes the idea of political equality by following the principle of 'one person, one vote'. Despite the differences, history shows that capitalists have established democracy worldwide and that democracy promotes capitalism by ensuring private property rights, financial incentives, market autonomy, privatization, and banking services. The question is, why do democracy and capitalism support each other even if they hold opposite ideals? What role does mass media play in the relationship between democracy and capitalism, and in what ways do they ensure their own development through reciprocity? By critically reviewing the classic literature on democracy and capitalism and recent texts on the subject matter and following an explanatory research method, this essay attempts to answer the questions posed. The article argues that democracy and capitalism support each other as part of survival mechanisms. Mass media expands capitalism by increasing consumer demand and establishing democracy as the best political ideal in the public mind. It concludes that capitalism, mass media, and democracy are not only interrelated but are three inseparable components of the same socio-political-economic cycle that enrich and protect each other through interaction; they collaborate because opposite political-economic approaches must overthrow them.

চাবিশব্দ: পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র, গণমাধ্যম, ক্ষমতা-পারস্পরিকতা, সমাজতন্ত্র

ভূমিকা

গত কয়েক শতাব্দীর রাজনীতি এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের একটি অন্যতম প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিলো পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্রের সম্পর্ক। এসময় গণতন্ত্র আবির্ভূত হয়েছে আধুনিক সভ্যতার 'সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার' হিসাবে। অন্যদিকে পুঁজিবাদকে আখ্যায়িত করা হয়েছে আধুনিক সভ্যতার নির্মাতা হিসাবে। জোসেফ সুম্পিটার যেমনটা বলেছেন– আধুনিক বিজ্ঞান, গণিতশাস্ত্র, বিমান, জীবন রক্ষাকারী ওষুধ, রেডিও-টেলিভিশন-ফ্রিজ সব কিছুর পিছনে রয়েছে পুঁজিবাদীর বিনিয়োগ, মুনাফার চিন্তা এবং অবশ্যই পুঁজিপতির উদ্ভাবনী উদ্যোগ।[১] রেঁনেসা-উত্তর ইউরোপে নব্য পুঁজিপতি ও মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করে আধুনিক গণতন্ত্রের। তথাপি গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে দর্শনগত ও চেতনাগত ব্যাপক ফাঁরাক রয়েছে। গণতন্ত্র সামাজিক-রাজনৈতিক সাম্যের কথা প্রচার করে, যেমন : আইনের চোখে সবাই সমান, এক ব্যক্তি এক ভোট, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে আম-জনতার অংশীদারিত্ব ইত্যাদি। কিন্তু পুঁজিবাদ মুনাফা স্ফীতিকরণ, বৈষম্য তথা পুঁজিপতি আর শ্রমিকের প্রভু-ভৃত্য

* সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ এবং পিএইচডি ফেলো, এডুকেশন ইউনিভার্সিটি অব হংকং

সম্পর্ককেই জানান দেয়। দর্শনগত বা ধারণাগত এসব পার্থক্য অবশ্য পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের বাস্তবিক নিবিড় সম্পর্ক বিলুপ্ত করতে পারেনা। ঐতিহাসিক ভাবেই, গণতন্ত্র আর পুঁজিবাদ সম্পর্কিত। অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্রের কেবল প্রথম নয়, একমাত্র পছন্দ পুঁজিবাদ। অন্যদিকে গণতন্ত্র ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি একটি বিমুখ প্রবণতা বজায় রাখে পুঁজিবাদ। এজন্য অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদকে পরস্পরের সমর্থক বলে অভিহিত করেছেন। যেমন গ্রাব্রিয়েল অ্যালমন্ডের মতে, পুঁজিঁবাদ গণতন্ত্রের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। পুঁজিবাদ নিজের মূল্যবোধ, বণিক-সংস্কৃতির আদান-প্রদান করে গণতন্ত্রের সঙ্গে।[২] এ প্রক্রিয়ায় নিজের উন্নয়নও করে পুঁজিবাদ। যুক্তি, ইতিহাস কিংবা সংখ্যাতাত্ত্বিক প্রমাণ সব কিছুই এ সম্পর্কের সাক্ষী। অবশ্য এটিও সত্য, গণতন্ত্রকে পুঁজিবাদ থেকে পৃথক, এমনকি পুঁজিবাদের অবাধ সম্প্রসারণে গণতন্ত্রকে বাধা হিসাবে বর্ণনা করেছেন অনেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানী।[৩] অবশ্য এ মতবাদ জ্ঞানের জগতে ঢেউ তুলতে পারেনি।

পুঁজিবাদ সম্প্রসারণশীল চরিত্রের কারণেই উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধ চষে বেড়াচ্ছে। অর্থনৈতিক এ মতবাদকে সামাজিক পাটাতনে যতই নিরপেক্ষ ভাবা হোক, বিশ্ব ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় স্থানিক কিংবা বৈশ্বিক পরিমন্ডলে পুঁজিবাদ ভয়াবহ রক্তপাত আর সহিংসতার মাধ্যমে চলার পথ তৈরী করে নিয়েছে। তবে দীর্ঘ সংঘাত অর্থের চেয়ে 'অনর্থ' সৃষ্টি করে। সেজন্য পুঁজির চায় সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক নিরাপত্তা; দরকার পুঁজির জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ দু'টি অব্যর্থ হাতিয়ার। নিজের অস্তিত্বের স্বার্থে যারা পুঁজিকে নি:শর্ত সমর্থন দেবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্র পুঁজির চলার পথ মসৃণ করে দেয়। আর সামাজিক-সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে অব্যাহত প্রচার-প্রচারণা দ্বারা গণমাধ্যম প্রসার ঘটায় ভোগবাদের। পুঁজির স্ফীতিকরণের শর্ত হিসাবে পণ্য চাহিদা সৃষ্টি খুবই প্রাসঙ্গিক। ভোগবাদী সংস্কৃতির পুনরুৎপাদন কেবল পুঁজির নিরাপত্তার জন্য জরুরি নয়, তা একই সঙ্গে গণতন্ত্র ও গণমাধ্যমের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির জন্যও জরুরি। সত্যিকার অর্থে, পুঁজিবাদ, গণমাধ্যম আর গণতন্ত্র কেবল আন্তঃসম্পর্কিত নয়, তা একই আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক চক্রের অবিচ্ছিন্ন তিন উপাদান যারা মিথষ্ক্রিয়ার মাধ্যমে পরস্পরকে পুষ্ট করছে। দর্শনগতভাবে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও কেন গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ একে অপরকে সাহায্য করে? গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক পরিগঠনে গণমাধ্যম কোন ভূমিকা রাখে কি? ঠিক কোন প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম আন্ত:সম্পর্কের জালে জড়িয়ে নিজেদের বিকাশ নিশ্চিত করে? বর্তমান প্রবন্ধটি তিনটি প্রশ্নকে সামনে রেখে আবর্তিত হয়েছে। অন্যভাবে, এই তিনিটি প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান এই প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

গবেষণা পদ্ধতি ও তথ্যের উৎস

এই গবেষণায় ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ (explanatory analysis) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। ব্যাখ্যামূলক গবেষণা হল কেন কিছু ঘটে বা ঘটে না বা কোন একটি বিষয় কেন একটি নির্দিষ্ট উপায়ে সংঘটিত হয় তা খুঁজে বের করার একটি পদ্ধতিগত উপায়।[৪] ব্যাখ্যামূলক গবেষণা সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণায় একটি কাঠামো প্রদান করে এবং তা একইসঙ্গে একধরনের অনুশীলন যা সামাজিক বাস্তবতা বোঝার দার্শনিক এবং পদ্ধতিগত উপায়। ব্যাখ্যামূলক কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দু হল একটি তাত্ত্বিক বা সামাজিক সমস্যা উপলব্ধি করা।[৫] একটি বিশেষ সামাজিক সমস্যা বা ঘটনা পরীক্ষা করার জন্য পর্যাপ্ত তথ্য বা তত্ত্বের অনুপস্থিতি থাকলে কিংবা জ্ঞান-জগতে সেসবের কার্য-কারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যায় একাধিক হাইপোথিসিস বিদ্যমান থাকলে গবেষকরা ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ

পদ্ধতি অনুসরণ করে নতুন অনুসিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে পারে। এই পদ্ধতিটি গভীরভাবে বিশ্লেষণের জন্য একটি সূচনা বিন্দু হিসাবে কাজ করতে পারে। একইসঙ্গে এটি একটি ঘটনার মূল কারণ বা ব্যাখ্যামূলক চলক সনাক্ত করার জন্য দিকনির্দেশ প্রদান করতে পারে।[৬] প্রবন্ধটিতে মূলত সেকেন্ডারি তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ এবং সমাজতন্ত্রের উপর ক্লাসিক ও গুরুত্বপূর্ণ বই এবং প্রবন্ধগুলি হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। যেমন এই প্রবন্ধে জোসেফ সুম্পিটার, মিল্টন ফ্রিডম্যান, সাইমুর লিপসেট, চার্লস লিন্ডব্লুম, রবার্ট ডাল, ল্যারি ডায়মন্ড, স্যামুয়েল হান্টিংটন, ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা, ফরিদ জাকারিয়াসহ বিখ্যাত উদারবাদী গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের তাত্ত্বিকদের লিটারেচার বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

কিছু ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিটি একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায় হতে পারে জটিল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রপঞ্চ ক্রিটিকালি উপস্থাপনের জন্য।[৭] বিশেষ করে ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করার জন্য বা জটিল রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রভাব বা বিনির্মাণের কারণ অনুসন্ধান করার ক্ষেত্রে ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতিটি সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য গবেষণা হাতিয়ার কেননা তা অনেকটা নিরপেক্ষ এবং নৈব্যক্তিকভাবে নির্ভরশীল, অনির্ভরশীল এবং মধ্যবর্তী চলকসমুহ বিশ্লেষণ করে। কিছু তাত্ত্বিক দাবি করেছেন ব্যাখ্যামূলক আখ্যান কার্যকারণ ব্যাখ্যায় সম্পূর্ণ পরিমাণগত পদ্ধতির (কোয়ান্টিটেটিভ মেথড) চেয়ে ভাল।[৮] এটি একটি জ্ঞানতাত্ত্বিক কাঠামো হিসাবে সামাজিক এবং মানববিজ্ঞান জুড়ে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, বিশেষ করে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, নৃবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক অধ্যয়নে।

গুরুত্বপূর্ণ মেথডলজিক্যাল প্রশ্ন হলো কেন এই প্রবন্ধ ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতি অনুসরণ করেছে বা এই গবেষণায় ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপযোগিতা কী? প্রথমত, এই গবেষণা সংখ্যাতাত্ত্বিক এপ্রোচ অনুসরণ করেনি উত্থাপিত প্রশ্নে উত্তর দানে; বরং এটি গুণগত (কোয়ালিটেটিভ) এপ্রোচ ব্যবহার করেছে। ব্যাখ্যামূলক গবেষণা পদ্ধতি গুণগত গবেষণার একটি অন্যতম প্রধান হাতিয়ার যা একদিকে ঐতিহাসিক ঘটনাক্রমের কেবল বর্ণনামূলক আখ্যান উপস্থাপন করেনা; অন্যদিকে তা কার্যকারণ সম্পর্ক ক্রিটিকালি অনুসন্ধান করে। এটি একইসঙ্গে গবেষণা বিষয়বস্তুর যুক্তিযুক্ত সংশ্লেষণ দ্বারা গ্রহণযোগ্য সিদ্ধান্তে/উপসংহারে পৌঁছাতে সাহায্য করে। ম্যাক্সওয়েল এবং মিত্তাপালির মতেঃ "The term explanatory research implies that the research in question is intended to explain, rather than simply to describe, the phenomena studied."[৯] অর্থাৎ ব্যাখ্যামূলক গবেষণা অধ্যয়নকৃত প্রশ্ন বা ঘটনার বর্ণনা করার পরিবর্তে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহী। এটি আমার গবেষণা লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। দ্বিতীয়ত, এই প্রবন্ধটি দুটি ঘটনার মধ্যে কার্যকারণ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে তাদের সহাবস্থানের কারণগুলি বোঝার চেষ্টা করেছে (যেমনঃ কেন পুঁজিবাদ, গণমাধ্যম এবং গণতন্ত্র এক অপরকে সমর্থন করে বা কেন তারা একটি আন্তঃসম্পর্কের জালে আবদ্ধ)। এই লক্ষ্যটি ব্যাখ্যামূলক বিশ্লেষণের ক্ষমতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কারণ সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ভেবার বলেছেন যে ব্যাখ্যামূলক অনুসন্ধান হল জটিল সামাজিক সমস্যা বা বাস্তবতা বোঝার অন্যতম হাতিয়ার।[১০] আমি এই প্রবন্ধে দাবি করেছি, গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের মধ্যে কোন আদর্শিক সংযোগ নেই এবং তারা ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে সহিংসতার মাধ্যমে উদ্ভূত হয়েছিল। তর্কাতীতভাবে, এই দাবির জন্য গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উৎপন্নকারী ঐতিহাসিক ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন, যা ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি পর্যাপ্তভাবে করতে পারে। একইসঙ্গে পুঁজিবাদ, গণমাধ্যম এবং গণতন্ত্র কেন এবং কিভাবে আন্তঃসম্পর্কের জালে আবদ্ধ এবং একটি মিথস্ক্রিয়া নীতি প্রতিষ্ঠা করে তা একটি জটিল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-

সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া, যা উপলব্ধির জন্য ব্যাখ্যামূলক পদ্ধতি একটি সম্প্রসারিত এবং অনির্ধারিত কাঠামো প্রদান করে। আমি এই পদ্ধতিটিকে ব্যবহার করেছি কার্যকারণ সম্পর্কের একটি মডেল তৈরি করার জন্য নয়; বরং আমার উত্থাপিত যুক্তির গভীর বিশ্লেষণ উপস্থাপনা হিসাবে। আমি সেজন্য একদিকে, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ, সমাজতন্ত্র, মার্কেট ব্যবস্থাপনা, গণমাধ্যমের বিকাশ এবং প্রভাব-এর উপর বিদ্যমান মৌলিক এবং গুরুত্বপূর্ণ লিটারেচার ব্যাখ্যা করেছি। অন্যদিকে, পর্যবেক্ষণ দ্বারা পুঁজিবাদ, গণমাধ্যম ও উদার গণতন্ত্রের উপর আমার নিজস্ব যুক্তি প্রসারিত করেছি। তাত্ত্বিকদের দাবি এবং ব্যাখ্যা গ্রহণ, বর্জন এবং প্রশ্নবিদ্ধ করেছি।

এই নিবন্ধের পরবর্তী আলোচনাসমূহ ছয়টি অংশে বিভক্ত। সেকশন ৩ গণতন্ত্র এবং পুঁজিবাদের তত্ত্ব আলোচনাপূর্বক তাদের সংজ্ঞা এবং প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি উপস্থাপন করেছে। পরবর্তী সেকশনে আলোচনা করা হয়েছে, তাত্ত্বিকেরা কিভাবে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা করেছে। এখানে আমি জ্ঞান-জগতে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক ঘিরে গড়ে ওঠা তিন ধরনের অনুকল্প বর্ণনা করেছি । পঞ্চম ও ষষ্ঠ সেকশনে যথাক্রমে আলোচনা করা হয়েছে পুঁজিবাদ কেন গণতন্ত্রকে সমর্থন করে এবং গণতন্ত্র কেন পুঁজিবাদের পক্ষ অবলম্বন করে। এই দুই সেকশনের আলোচনা প্রবন্ধে উত্থাপিত প্রথম প্রশ্নকে ফোকাস করে- কেন পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্র পরস্পরকে সমর্থন করে যেখানে তাদের মধ্যে কোন আদর্শিক সম্পর্ক নেই। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক পরিগঠনে গণমাধ্যম কেমন ভূমিকা পালন করে তা সপ্তম সেকশনে আলোচনা করা হয়েছে। অস্টম সেকশন মূলত গবেষণা ফলাফলকে উপস্থাপন করেছে যেখানে প্রধানত ব্যাখ্যা করা হয়েছে কিভাবে এবং কেন পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র ও গণমাধ্যম আন্তঃসম্পর্কের জালে আবদ্ধ, যা গবেষণার মূল প্রশ্নের যুক্তিযুক্ত উত্তরদানে চেষ্টা করেছে।

গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও গণমাধ্যমঃ তত্ত্ব পুনঃপাঠ

গণতন্ত্র

বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র সবচেয়ে জনপ্রিয় শাসন ব্যাবস্থা হলেও এর সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা নেই। গণতন্ত্রের সংজ্ঞায়নে কখনো আইন, কখনো ভোট আবার কখনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে গুরুত্ব দেয়া হয়। অসংখ্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানী, বেসামরিক-সামরিক শাসক এমনকি ধর্মীয় নেতারা গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিজের সুবিধা মতো। মোটা দাগে গণতন্ত্রের সংজ্ঞায়নে আইনের শাসন, জনকর্তৃত্ব, ভোট আর অংশগ্রহণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ডায়মন্ড, লিনজ ও লিপসেট সু-গণতন্ত্র অর্থে কিছু শর্ত আরোপ করেছেন, যেসব তাদের মতে 'গণতন্ত্রের স্তম্ভ'। আর সেগুলো হলো–আইনের শাসন অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, জবাবদিহিতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, রাজনৈতিক সাম্য ও সাড়া প্রদান।[১১] সম্প্রতি গণতন্ত্রের সংজ্ঞায়নে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, রাজনীতি বিজ্ঞানে যাকে বলা হয় 'ডেলিবারেট ডেমোক্রেসি'। রবার্ট ডাল শুধু ভোটগ্রহণকে গুরুত্ব না দিয়ে সামগ্রিক অংশগ্রহণের অধিকারের আলোকে গণতন্ত্রকে ব্যাখ্যা করেন। পলিয়ার্কির ধারণা দিয়ে ডাল গণতন্ত্রের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বেশ কিছু শর্ত জুড়ে দেন- সংগঠনের অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, চিন্তার স্বাধীনতা, ভোটাধিকার, সরকারী পদের জন্য উন্মুক্ত প্রতিযোগিতা, নেতৃত্বের অধিকার, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন ইত্যাদি।[১২] ও'ডানিয়েলের মতে, গণতন্ত্র এমন এক শাসন ব্যবস্থা যা তিনটি চলকের ওপর নির্ভর করেঃ নির্বাচন, মানবাধিকার এবং সরকারের জবাবদিহিতা।[১৩] বর্তমান সময়ে গণতন্ত্রের অন্যতম তাত্ত্বিক ল্যারি ডায়মন্ড লিখেছেন,

গণতন্ত্র হলো এমন এক সরকার ব্যবস্থা যেখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা অবাধ, নিরপেক্ষ, নিয়মিত ও প্রতিযোগিতাপূর্ণ (বহুদলীয়) নির্বাচনের মাধ্যমে অর্পিত হয়।[১৪] অনুরূপ মতামত লিপসেট উপস্থাপন করে দাবি করেছেন:

> ÒDemocracy (in a complex society) is defined as a political system, which supplies regular constitutional opportunities for changing the governing officials. It is a social mechanism for the resolution of the problem of societal decision-making among conflicting interest groups, which permits the largest possible part of the population to influence these decisions through their ability to choose among alternative contenders for political officeÓ.[15]

এই প্রবন্ধে গণতন্ত্র বলতে এমন এক রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে নির্দেশ করা হয়েছে যেখানে সাংবিধানিক উপায়ে নিয়মত ক্ষমতা পরিবর্তনের সুযোগ সৃষ্টি হয় প্রতিযোগিতামূলক ভোটের মাধ্যমে এবং যেখানে বিবাদমান স্বার্থবাদী গোষ্ঠীগুলো সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের সুযোগ লাভ করে।

পুঁজিবাদ

গণতন্ত্রের মতো পুঁজিবাদের সংজ্ঞায়ন তত জটিল নয়। কেননা বাজার ব্যবস্থা আর ব্যক্তি মালিকানার বৈশিষ্ট্যমন্ডিত পুঁজিবাদের সংজ্ঞায়নের ক্ষেত্রে নব ধারা সৃষ্টি বেশ জটিল; সেই সূত্রে বিচ্যুতির সম্ভবনাও কম। পুঁজিবাদ বলতে বুঝায় এমন এক ব্যবস্থা যেখানে ব্যক্তিগত সম্পত্তির অবাধ কেন্দ্রীকরণের অধিকার থাকে এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রিত হয় উদ্যোক্তা শ্রেণি কর্তৃক।[১৬] বেইলীর মতে, “Capitalism’ is essentially derived from ‘capital’, an accretion of wealth”।[১৭] উদ্যোক্তা এবং ভোক্তার স্বাধীনতার জন্য পরিচিত বা অন্যান্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা থেকে পুঁজিবাদে পণ্য ও সেবার উৎপাদন অনেক বেশি কার্যকর ভাবে সম্পন্ন হয় কেননা সেখানে সবকিছু নিয়ন্ত্রিত অদৃশ্য স্বাধীন ব্যবস্থা (হাত) দ্বারা।[১৮] সুম্পিটারের মতে মুনাফার অভিলাষ হলো পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় বিষয় যা আবার দুটো বিষয়ের উপর নির্ভরশীল: উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও অবাধ বাণিজ্য। তবে রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি জীবনে পুঁজিবাদ কেবল অর্থনৈতিক গন্ডিতে আবদ্ধ নয়। বাজার, শিল্প সংগঠন আর পুঁজিবাদী উদ্যোক্তার কল্যাণে সমাজ দ্রুততার সাথে বিবর্তিত হতে থাকে। নতুন পণ্য সংস্কৃতি, নতুন উৎপাদন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, নতুন বাজার এবং নতুন শিল্প সংগঠন-কাঠামো নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে সমাজ ও রাজনীতির ওপর। যেমনটা বলেছেন সুম্পিটার লিখেছেন: “The fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the new consumers’ goods, the new methods of production or transportation, the new markets, the new forms of industrial organization that capitalist enterprise creates. ”[১৯]

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, পুঁজিবাদ হলো এমন এক আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা যেখানে পণ্য ও সেবার আদান-প্রদানে ব্যক্তি পূর্ণ স্বাধীন এবং যেখানে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শক্তির হস্তক্ষেপ ছাড়া; তবে সেখানে কাজ করে অদৃশ্য হাত যা সমন্বয় করে চাহিদা ও যোগানের জটিল হিসাব।

গণমাধ্যম

গণমাধ্যম হলো বিস্তৃত পরিসরে একই সময়ে তথ্য প্রকাশের হাতিয়ার। তা কেবল তথ্য প্রকাশ করে না; গড়ে দেয় ব্যক্তির মনঃস্তত্বও। গণমাধ্যম স্বভাবগত বৈচিত্র্য, গতিশীলতা ও কেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে বির্নিমাণ করে 'গণসংস্কৃতি' যেখানে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ও বিশ্বাস 'সমজাতীয়' হয়ে ওঠে।[২০] কারেন্স এবং পার্লফ বলেছেন, গণমাধ্যম জনগণের আচরণ, অংশগ্রহণ ও মনঃস্তত্বকে নির্ধারন করে।[২১] উপরন্তু গণমাধ্যম ব্যবহার করে রাজনৈতিক নেতারা 'জনমত' বা 'ইমেজ' তৈরি করে। গণমাধ্যম একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক সামাজিকীকরণের এজেন্ট। গণমাধ্যম কোনো সংস্থার ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে, তাকে দৃঢ় করতে পারে। আবার তার বিরুদ্ধে গণমতও গড়ে তুলতে পারে। যেখানে জনগণের কোনো অভিজ্ঞতা নেই, সেখানে গণমাধ্যম নতুন ধারণা সৃষ্টি করতে সক্ষম। মনোজগতে সচলতা তৈরি করে গণমাধ্যম ব্যক্তিকে সমৃদ্ধ জীবনের ছবি দেখায়, গতানুগতিক জীবনের বদ্ধ পরিধি থেকে তাকে মুক্ত করে আধুনিক জীবনের দিকে অগ্রসর হতে উদ্বুদ্ধ করে।[২২] গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিচার-বিশ্লেষণ-উদাহরণ প্রয়োগ করে মানুষের মূল্যবোধ ও বিশ্বাস কাঠামো গঠন করে; আরোপ করে ভাল-মন্দের 'ইমেজ'। এমনকি আধিপত্য কায়েম করে কল্পনা-জগতেও। প্রযুক্তিগত ক্ষমতায় গণমাধ্যম মানুষের ইন্দ্রিয়গত প্রত্যক্ষণ, কর্তৃত্ব, আত্মপরিচয় এবং তাৎপর্যের ধারণা পরিবর্তন করে দেয়। এ প্রেক্ষাপটেই 'সেই সত্য যা রচিব আমি'– আর সত্য থাকে না বরং সত্য হয়ে ওঠে সেই সব বিষয়াবলি যা বর্ণমালার হরফে প্রকাশ পায় কিংবা দেখা যায় রঙিন পর্দায়।

গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ ও গণমাধ্যম

আর্থ-সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক বিষয়াদি পরস্পর ঘনিষ্ঠ। যে কোন ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন অন্যান্য বিষয়াদিতে 'চেইন রি-এ্যাকশন' এর আদলে আঘাত করে; পরিবর্তন আনে অন্যসব ক্ষেত্রেও। ইংল্যান্ডের গৌরবময় রক্তপাতহীন বিপ্লব (১৬৮৮), ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯) আর যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৬-১৭৮০) আমূল বদলে দেয় পশ্চিমা সমাজের ক্ষমতা কাঠামো। পুঁজিবাদ সমর্থিত এসব আন্দোলনের মাধ্যমে সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র আর অভিজাততন্ত্রের পুরানো ক্ষমতা কাঠামো ভেঙ্গে পড়তে শুরু করে। সামন্তপ্রভু আর যাজকদের হঠিয়ে নব্য পুঁজিপতি আর মধ্যবিত্ত (যাদের একটি বড় অংশ আইনজীবী) ক্ষমতার জ্যোতিকেন্দ্রে চলে আসে। রূপান্তর ও পরিবর্তনের ধারাবাহিক ঘটনাসমূহ বদলে দেয় মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার স্থিরকৃত সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমন্ডল। বিশ্বসভ্যতা সেই অভূতপূর্ব ঘটনার জন্ম দেয় যা চলতি ইতিহাসে 'শিল্প বিপ্লব' বলে অভিহিত। আবার রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক এইসব পট পরিবর্তনকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করছে ত্রয়োদশ শতকে শুরু হওয়া আলোকায়ন বা রেঁনেসা। চক্রাকারে প্রভাবিত এইসব ঘটনাবলীর যে কোনটিকে দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় কেন্দ্রে নিয়ে আসা যায়। সে বিতর্ক প্রসারিত না করে চলমান প্রবন্ধ এই প্রস্তাবনায় পক্ষপাতী যে, রেঁনেসা থেকে শিল্প বিপ্লব এবং তৎপরবর্তী উপনিবেশীকরণের মধ্যদিয়ে ইউরোপে একইসঙ্গে বিকাশ ঘটে পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র আর গণমাধ্যমের। পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া আর অভিযোজন ক্ষমতা তিনটি প্রতিষ্ঠানকেই শক্তিশালী করেছে। জাতীয়তাবাদের বিকাশ এই ত্রয়ী-সম্পর্ককে আরো পুষ্ট করে। মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কারের (১৪৯৮) পর নব্য পুঁজিপতি শ্রেণি মতাদর্শিক জগতে আধিপত্য বিস্তারের এক অব্যর্থ অস্ত্র পেয়ে যায়। জাতীয়তাবাদ চিন্তার স্বাধীনতা, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতার শ্লোগান নিয়ে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রিন্ট-মিডিয়াকে সম্বল করে কেন্দ্র থেকে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।[২৩] সামন্ততন্ত্র-

রাজতন্ত্র-পোপতন্ত্রের স্থিরকৃত কাঠামোর কোন প্রস্তুতি, কৌশল আরো বাড়িয়ে বললে সক্ষমতা ছিলোনা 'ভয়েজ অব পিপল, ভয়েজ অব গড' এর মতো সম্মোহনী মতবাদকে রুখে দেওয়ার। বলপ্রয়োগের সনাতনীপন্থা শুরুতে কিছুটা সফলতা আনলেও নতুন মতবাদ যখন আরো বেশি সহিংস হয়ে ইংল্যান্ড (১৬৪৯), ফ্রান্স (১৭৮৯), রাশিয়ায় (১৯১৭) রাজাদের শিরোচ্ছেদে সক্ষম হয় তখন পুরাতন রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্র-পোপতন্ত্রের গাঁট ছাড়া সম্পর্কের স্থিরকৃত বিধি-ব্যবস্থার পরিবর্তন বা রূপান্তর ছাড়া আর কোন বিকল্প অবশিষ্ট ছিলো না।[২৪] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এসময় সামন্ত প্রভুরা দ্রুত নিজেদের পুঁজিপতি শ্রেণিতে রূপান্তরিত করে নতুন ধারার মধ্যে একীভূত হয়ে যায়। এই প্রেক্ষাপটেই জন্ম হয় রাজনৈতিক দলের যার নিয়ন্ত্রণে থাকে আইনজীবী, মধ্যবিত্ত ও উঠতি পুঁজিপতিরা। শিল্পোবিপ্লব পরবর্তী অষ্টদশ শতকে ইউরোপে পার্লামেন্ট গণসমাজের প্রতিনিধি হিসাবে ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে আসে। তবে ক্ষমতার কেন্দ্রাতিক প্রবণতা আর নির্বাচন ব্যবস্থার কারণে পার্লামেন্টের নামে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয় সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজনৈতিক দলের কাছে। স্টুয়ার্ট মিলের *রিপ্রেজেনটেটিভ গভর্নমেন্ট* গ্রন্থে তার স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে। তবে অচিরেই রাজনৈতিক দলের বদলে ক্ষমতা চলে যায় ছোট্ট একটি ক্যাবিনেটের হাতে এবং সেই সূত্র ধরে সরকার প্রধানের হাতে।[২৫]

গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক: মিথস্ক্রিয়া বনাম পৃথকতার অনুকল্প বিশ্লেষণ

প্রতিটি সমাজেই রাজনীতি ও অর্থনীতি সম্পর্কিত। কার্ল মার্ক্স অর্থনীতিকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে বলেছেন- অর্থনীতি হলো ভিত্তি কাঠামো (বেসিক স্ট্রাকচার) যা নির্ধারণ করে দেয় উপরি কাঠামো (সুপার স্ট্রাকচার) অর্থাৎ রাজনৈতিক কাঠামোসহ ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক। অ্যালমন্ড অর্থনীতি ও রাজনীতিকে মানব সমাজের সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসাবে বর্ণনা করে রাজনীতি-অর্থনীতির সম্পর্ক টেনে বলেছেন: "The economy and the polity are the main problem solving mechanisms of human society. They each have their distinctive means, and they each have their ÔgoodsÕ or ends. They necessarily interact with each other, and transform each other in the process."[২৬]

আর এ কারণেই আমরা দেখি দাস কেন্দ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা জন্ম দেয় অভিজাততন্ত্রের বলয় যেখানে প্লেটো-এরিস্টটল দাসপ্রথাকে কেবল অপরিহার্য নয়, 'নৈতিক' বলে আখ্যায়িত করেছেন। সামন্ততন্ত্র ধারক হয়ে ওঠে রাজতন্ত্র ও পোপতন্ত্রের। পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থা পণ্যের প্রসার আর বিশাল ভোক্তা শ্রেণী তৈরীর মুনাফা কেন্দ্রিক চাহিদার কারণে পক্ষ নেয় গণতন্ত্রের। গণতন্ত্র ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীভূত করে সমাজের স্তরে স্তরে বিদ্যুতছটার মতো ছড়িয়ে দেয়। আধুনিকীকরণের দু'টি অবিচ্ছেদ্য উপাদান গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ। ঐতিহাসিকভাবে দুটি উপাদান কেবল সম্পর্কযুক্ত নয়, সম্পর্কের মাত্রা এতটাই তীব্র এবং স্বতঃস্ফূর্ত যে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলে থাকেন গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক প্রকৃতিজাত।[২৭] পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হলেও গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ দুটি ভিন্ন প্রপঞ্চ। দুটি ভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান। কেননা গণতন্ত্র হলো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া, সেই সূত্রে যা 'মূল্যবোধের কর্তৃত্বপূর্ণ বরাদ্দের' সঙ্গে সম্পর্কিত। অর্থাৎ গণতন্ত্র নিখাদ রাজনৈতিক। অন্যদিকে পুঁজিবাদ হলো অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা, যা অবাধ বাণিজ্যের কথা বলে ব্যক্তিগত মালিকানা ও মুনাফা স্ফীতিকরণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। ফরিদ জাকারিয়া লিখেছেন গণতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্ক খুবই প্রাসঙ্গিক। লিপসেট গণতন্ত্রের সঙ্গে পুঁজিবাদের অত্যন্ত নিবিড় সম্পর্কের

কথা বলেছিলেন, অনেক তর্ক-বিতর্কের শেষে সেই অনুকল্প চার দশক পরেও জ্ঞান জগতে শক্তিশালী অবস্থান নিয়েই টিকে আছে বলে মনে করেন ফরিদ জাকারিয়া।[২৮]

জ্ঞান-জগতে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক আলোচনায় তিন ধরনের অনুকল্প রয়েছে। প্রথমত, পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্র আন্তঃ সম্পর্কিত। এই মতবাদের প্রচারকরা[২৯] বিশ্বাস করেন, দুটো মতবাদই উদারতাবাদের ধারক। উভয় মতবাদই ব্যক্তির উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে বিশ্বাস করে। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ পরিগঠনে পুঁজিবাদ মুখ্য ভূমিকা রাখে। অপরদিকে, গণতন্ত্র ব্যক্তির সম্পত্তি অর্জনের অধিকার কেবল নয়, বিপুল সম্পদ পুঞ্জিভূতকরণের স্বীকৃতি দিয়ে পুঁজিবাদের সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে গণতন্ত্র। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয় ব্যক্তিগত দক্ষতা, অংশগ্রহণ এবং পছন্দ-অপছন্দকে গুরুত্ব দেয়।

দ্বিতীয় ধারায় বিশ্বাস করা হয়, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সম্পর্ক বর্তমান বিশ্বে ঘনিষ্ঠ হলেও এ দু'টো বিষয় পরস্পর বিরোধী।[৩০] পুঁজিবাদ সম্পদের ক্ষেত্রে বিশাল বৈষম্য তৈরী করে সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিস্ফোরিত অবস্থার জন্ম দেয়। কিন্তু গণতন্ত্র রাজনৈতিক সমতার কথা বলে; ভোট, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্ম পালন, সামাজিক গতিশীলতার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সবাই সমান অধিকার ভোগ করে। কাজেই পুঁজিবাদ-গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী। পুঁজিবাদ অসাম্যের ধারক; গণতন্ত্র রাজনৈতিক সমতায় বিশ্বাসী। এজন্য পুঁজিবাদী ব্যবস্থা আর গণতন্ত্রকে দুটি পৃথক ও সাংঘর্ষিক বিষয় বলে মনে করেন এন্থনী ডনস।[৩১] তাঁর মতে, দীর্ঘকাল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র পুঁজিবাদের বিকাশের জন্য সহায়ক নয়। যুক্তরাজ্যের উদাহরণ টেনে তিনি বলেছেন, বিভিন্ন চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বিরোধিতায় ও গণতন্ত্রের আপষকামী ভূমিকায় পুঁজিবাদ যুক্তরাজ্যে বাধাগ্রস্ত হয়েছে।

তৃতীয় ধারাটি দ্বিতীয় ধারার সম্প্রসারিত বা সংশোধিত রূপ। এই ধারার তাত্ত্বিকরা বিশ্বাস করেন পার্থক্য স্বত্ত্বেও গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত, বিশেষত একে অপরের সংশোধনে 'কারেকটিভ মেজারস' হিসেবে কাজ করে।[৩২] পুঁজিবাদের 'পুঞ্জিভূত অসমতা' তথা ধনী-দরিদ্র বৈষম্য গণতন্ত্র দূর করে বা প্রশমিত করে। গণতন্ত্র পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের সম্ভাবনা নস্যাত করে দেয়। এই ধারায় বিশ্বাস করা হয়, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে বিরোধ থাকলেও তা বিচ্ছিন্ন হওয়ার মতো কোন বিষয় নয়, কেননা উদ্ভবগত উপাদান ও স্বার্থগত চাহিদার কারণে কেউ পৃথক হতে চায় না। রবার্ট ডালের ভাষায় 'two persons bound in a tempestuous marriage that is ripen by conflict and yet endures because neither partner wishes to separate from other ".[৩৩] অর্থাৎ বিশ্বের আধুনিক ইতিহাস এই দুই শক্তির গাঁটবদ্ধতার সাক্ষী। বর্তমান সভ্যতা এই দুই শক্তির পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল।

গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ উভয়ই ব্যক্তির দক্ষতা, পছন্দ ও অংশগ্রহণের পক্ষে । গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় শক্তি ব্যক্তিস্বতন্ত্রবাদ ও উদারতাবাদ।[৩৪] হাঙ্গেরিয়ান দার্শনিক জি. এম. টমাস বলেছেন, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ একত্রিত হয়ে সুনির্দিষ্ট কিছু সাংস্কৃতিক বিষয়াদির জন্ম দেয় যা উভয়কেই শক্তিশালী করে।[৩৫] টমাস স্পষ্টভাবে বলেছেন, হাঙ্গেরি বা পূর্ব ইউরোপে পশ্চিমের মূল ভূ-খন্ডের মতো গণতন্ত্র বিকশিত হবে না, কেননা সেখানে 'সাংস্কৃতিক শর্তগুলো' অনুপস্থিত রয়েছে।[৩৬] তাঁর মতে পূর্ব ইউরোপের মানুষ এখনও প্রাচ্যের মতো পুঁজিবাদ ঘৃণা করে, তারা প্রতি-ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী। টমাসের অনুসিদ্ধান্ত হতে দু'টি বিষয় স্পষ্ট; প্রথমত, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ সমন্বিতভাবে উভয়ের জন্য

প্রয়োজনীয় সাংস্কৃতিক ভিত্তি দান করে। অর্থাৎ তা নিবিড়ভাবে জন্ম-মৃত্যুর প্রশ্নসহ ঘনিষ্ঠ। দ্বিতীয়ত, পুঁজিবাদকে পশ্চিম-ইউরোপের মতো পুরোপুরিভাবে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গ্রহণ না করলে উদার গণতন্ত্র ধরা দিবে না। যার অন্য অর্থ, গণতন্ত্র কেবল তখনই দৃশ্যমান হবে যখন অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পুঁজিপতিরা স্বপোষী ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ উচ্ছেদ করবে। এর প্রমাণ রয়েছে ডালের জবানে: "এটি একটি ঐতিহাসিক সত্য যে আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান প্রধানত ব্যক্তি মালিকানাধীন, বাজারমুখী অর্থনীতি বা পুঁজিবাদের দেশগুলিতেই বিদ্যমান। এটিও সত্য যে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, কেন্দ্রীয়ভাবে নির্দেশিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাসহ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ সমুহ বা কমান্ড অর্থনীতি, গণতান্ত্রিক সরকারগুলি উপভোগ করেনি; বরং কর্তৃত্ববাদী একনায়কতন্ত্র দ্বারা শাসিত হয়েছে"।[৩৭] সংগত কারণে এটা মনে করা যুক্তিযুক্ত যে, বাজার-ভিত্তিক অর্থনীতি গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয়, এটি একটি ঐতিহাসিক প্রমাণ যেখানে কোন সন্দেহ নেই।

উল্লিখিত বক্তব্যের সহজ পাঠ হলো- গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রধানতম শর্ত, যেমন সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনে দরকার কর্তৃত্ববাদী সরকার ব্যবস্থা। গত শতাব্দীর অভিজ্ঞতা এ উপসংহার টানতে সাহায্য করে। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ আর সংস্কৃতি পরিগঠন করে গণমাধ্যম। স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিংবা জনসমাজে জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য নয়, গণমাধ্যম অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে ও ব্যবসায়িক স্বার্থেই টমাস কথিত 'সাংস্কৃতিক শর্তাবলির' জন্ম দেয়। আর এক্ষেত্রে গণমাধ্যম ব্যবহার করে জাদুগুণিতিক ক্ষমতা (magic multiplayer) যা ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তনের তাগিদ সৃষ্টি করে।[৩৮] ব্যক্তির কল্লোজগতে হানা দেয় দুর্দমনীয় 'পণ্য চাহিদা'। এই পণ্য চাহিদা এতটাই তীব্র, সম্মোহিত এবং নেশা উৎপাদনকারী যে ভোক্তা সুনির্দিষ্ট সেই পণ্য না পেয়ে আত্মহত্যাও করে। কেবল পণ্য চাহিদা তৈরি নয়; গণসমাজে গণতন্ত্রের প্রতি জন-আকাঙ্ক্ষাও তৈরী করে গণমাধ্যম। প্রযুক্তি উৎকর্ষতার ডয়েচে ভেলী থেকে বাংলাদেশের প্রান্তিক বিদ্যুৎহীন গ্রাম- উভয় জনপদেই গণমাধ্যমের এ ভূমিকা রয়েছে।[৩৯] এক্ষেত্রে লিন্ডব্লমের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য- "বাজার ব্যবস্থা বা পুঁজিবাদ কেবল অসাম্য উদ্রেককারী নয়, তা একই সঙ্গে একটি শক্তি ব্যবস্থা (power system)। এটি এমন এক ব্যবস্থা যা নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তির আচরণ, আরোপ করে সামাজিক স্তর বিন্যাস (পদ ও শৃঙ্খলার নামে) এবং বিভিন্ন ধরনের আন্তঃসম্পর্কিত নিয়ন্ত্রণ"।[৪০]

দু'টি চলকের সম্পর্ক বিপরীতমুখী হলেও গত তিন শতাব্দী জুড়ে গণতন্ত্র কিংবা পুঁজিবাদ নিজের অস্তিত্ব রক্ষার লড়াইয়ে বরাবরই অপর হাতিয়ারটি ব্যবহার করেছে। চলতি বিশ্বে কোন পুঁজিবাদী রাষ্ট্র নেই যা গণতান্ত্রিক নয়; আবার কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের দেখা পাওয়া যাবে না যা পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা দ্বারা পরিচালিত নয়। এটি সম্ভব হয়েছে গণতন্ত্রের পক্ষে পুঁজিপতি তথা ক্ষমতাবান ব্যক্তির (এলিট) অব্যাহত প্রচারে। ক্ষমতাবান ব্যক্তির আরোপিত চিন্তা ধারার আলোকেই গণ-মানুষ গড়ে নেয় নিজেদের জগত, জগতের মতাদর্শ, পছন্দ-অপছন্দ। পাশ্চাত্যের এক গবেষকের জবানে পশ্চিমা গণতন্ত্র হল একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে লোকেরা তাদের অভিজাতদের দ্বারা যা শেখানো হয়েছে তা তাদের সরকারের কাছে দাবি করে। এইভাবে জনপ্রিয় নিয়ন্ত্রণ হলো অনেকটা শর্ট সার্কিটের মতো যেখানে গণতন্ত্র সার্কিটের বা নিয়ন্ত্রকের মতো ভূমিকা পালন করে।[৪১]

পুঁজিবাদী বা বাজার ব্যবস্থা উপড়ে ফেলে স্বপোষী (subsistence) অর্থনীতি-উদ্ভূত চক্রাকার সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবন। জন্ম দেয় মধ্যবিত্তের যারা প্রকৃতিগতভাবে গণতন্ত্রের মিত্র। পলিটির ধারণা দিয়ে অ্যারিস্টটল প্রথম এ বিষয়ে আলোচনা করেছিলেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণে চায় স্বাধীনতা, কামনা করে কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণহীনতা। কিন্তু সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং চাহিদা ও যোগানের সমন্বয়ের জন্য সরকার চায় অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করতে। গণতন্ত্র তত্ত্বগতভাবে অন্য রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে অনেক বেশি বিকেন্দ্রীভূত এবং অর্থনীতিতে কম হস্তক্ষেপে বিশ্বাসী। আর এ কারণেই পুঁজিবাদের পছন্দ গণতন্ত্র যা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্ষমতা হ্রাসের পক্ষে। কমিউনিজম একইসঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মতবাদ যা কেন্দ্রীয়ভাবে রাজনীতি এবং অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ধারণা দেয়। কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক-প্রশাসনিক আমলাতন্ত্র এ ব্যবস্থায় নিয়ন্ত্রণ করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা। অন্যদিকে সামন্ততন্ত্র আর্থ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একই ব্যক্তির অধিপত্য কায়েম করে। রাজা-পোপ-লর্ড-ডিউক-নাইটদের কেন্দ্রীভূত ও বংশীয় ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করে।

পুঁজিবাদ কেন গণতন্ত্রকে সমর্থন করে?

সাম্যের মহান ব্রতই গণতন্ত্রের শক্তি। তবে সে সাম্য কেবলই রাজনৈতিক আলঙ্কারিক বিষয় যা এক ব্যক্তি এক ভোটের দর্শন প্রচার করে সামাজিক সাম্যের কথা প্রচার করে। আর এ কারণেই গণতান্ত্রিক সরকার হয়ে ওঠে পুঁজিবাদের বন্ধু; *কমিউনিস্ট ইশতাহার*-এ মার্ক্স-এঙ্গেলস যাকে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় বলেছেন 'পুঁজিপতি অনুমোদিত সমিতি'। পুঁজিবাদী রাষ্ট্র ব্যবস্থায় জনগণ পৃথক রাজনৈতিক দলে বিভক্ত হয়ে ক্ষমতা প্রাপ্তির সহিংস/অনুমোদিত পথে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। ফলশ্রুতিতে সম্পদের বণ্টন ও বৈষম্যের মৌলিক প্রশ্ন অন্তরালে চলে যায়; গণমাধ্যম রাজনৈতিক প্রশাসনিক এলিটদের খবর প্রচার করে একটি উপরি কাঠামোর দ্বন্দ্বে জনগণের মনোযোগ, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া আবদ্ধ রাখে। ট্রেড ইউনিয়নের পুঁজিবাদীকরণ, দলীয়করণ, বিভক্তকরণ, খন্ডিতকরণ কোথাও আবার নিষিদ্ধকরণের মাধ্যমে গণতন্ত্র পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে। রাজনৈতিক দলের উদ্ভব, বিকাশ, ক্ষমতারোহণ এবং তৃর্ণমূল পর্যন্ত বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামোর জন্য পুঁজিবাদী রাজনৈতিক দল যে কোন অসন্তোষ বা বিদ্রোহে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা নেয়। আর এ কারণে বিদ্রোহ রূপ নেয় না সমাজ পরিবর্তনের বিপ্লবে। দুজন তাত্ত্বিক এই প্রসঙ্গে বলেছেন- "Democracy is essentially a means, a utilitarian device for safeguarding internal peace and individual freedom, with a commitment to the progressive extension of people's capacity to govern their personal lives and social histories" ।[৪২]

গণতন্ত্র আসলে ব্যক্তিক দক্ষতা, আর শান্তি রক্ষার নামে পুঁজিপতিকেই রক্ষা করে। সমস্ত রাষ্ট্রীয় বল প্রয়োগেকারী শক্তি দিয়ে বিদ্যমান উৎপাদন সম্পর্ক রক্ষা করে গণতন্ত্র। পার্লামেন্ট নিয়ন্ত্রণে থাকায় দ্রুত কিছু বরাদ্দ দিয়ে, আইন করে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা স্থিতিশীল রাখে রাজনৈতিক দলগুলো; পার্লামেন্ট এবং রাজনৈতিক দলগুলোতে কার্যকর নিয়ন্ত্রণ থাকে পুঁজিপতিদের। এসব কোন কৌশল কাজ না করলে আপাত শান্ত গণতন্ত্র ভয়ংকর নখ-দন্ত নিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষার নামে ধ্বংস করে, উপড়ে ফেলে বিরোধী মত। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সেনাবাহিনীর উপস্থিতি, মরণাস্ত্রের সমৃদ্ধি আর পরাশক্তির সঙ্গে সেই স্থানিক শক্তির মিত্রতা বিচার করতে হবে এ প্রেক্ষিতেই। সপ্তদশ শতকে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ পৃথক দুটি বিষয় ছিলো, অনেক ক্ষেত্রে তা সাংঘর্ষিকও ছিলো। তবে জাতীয় রাষ্ট্র বিশেষত কল্যাণকামী রাষ্ট্রের ধারণা প্রসারিত হলে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ একই পাটাতনে সামিল

হয়। জনকল্যাণ প্রচারিত আদর্শ হলেও এর সত্যিকার লক্ষ ছিলো 'সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী' তৈরী করে পুঁজিবাদের উপজাত পরিষ্কারের আলোকে বিপ্লব তিরোহিত করা আর গণতান্ত্রিক সরকারকে জনপ্রিয় করা। এ প্রেক্ষাপটে মুলার বলেছেন, 'It was the creation of the modern welfare state that finally enabled capitalism and democracy to coexist in relative harmony.'[৪৩]

গণতন্ত্র চারটি প্রক্রিয়ায় পুঁজিবাদী ব্যবস্থার প্রসার ও স্থায়ীকরণে ভূমিকা পালন করছে–

প্রথমত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রণোদনা, সরাসরি আর্থিক সাহায্য, ব্যাংক ঋণ দিয়ে পুঁজিপতির সম্পদ কেন্দ্রীকরণে সাহায্য করছে। পুঁজিপতিদের লুণ্ঠনে রাষ্ট্রের সমাহীন পৃষ্ঠপোষকতা এক্ষেত্রে বেশ ভালো উদাহরণ। বাংলাদেশে ২০২২ সালে খেলাপী ঋণের পরিমাণ ছিলো ১৩৪৩ বিলিয়ন টাকা।[৪৪] আর এই খেলাপীদের সবাই ধনিক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। গণতন্ত্রের কল্যাণে ট্রিলিয়ন ডলার প্যাকেজ প্রণোদনা পেয়ে গণতন্ত্র অন্তত দু'বার প্রাণ পেয়েছে। ১৯৩০'র দশকের মহামন্দা ও ২০০৮ সালের বিশ্বমন্দা মোকাবেলায় পুঁজিবাদ পেয়েছিলো 'প্রণোদনা' হিসাবে রাষ্ট্রীয় কোষাগারের অফুরন্ত সাহায্য। কসমোপলিটন-স্যাটেলাইট উভয় রাষ্ট্রই এ ভূমিকা নিয়েছে।[৪৫] গতিশীল পুঁজিবাদ টিকে থাকে পুঁজিপতির ঝুঁকি আর উদ্যমের কল্যাণে। গণতন্ত্র এক্ষেত্রে উদ্যোক্তাদের প্রণোদনার ঝুড়ি বরাদ্দ করে। সম্পদ আর অর্থের ছাড় ছাড়াও গণতন্ত্র মহান পুঁজিপতিদের প্রদান করে শ্রম নিষ্পেষণের খোলা চেক।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রীয় নীতিসমূহ পুঁজিপতিদের অনুকূলে বরাদ্দ করে গণতন্ত্র পুঁজির নিরাপত্তা, পুঞ্জিভূতকরণ ও কেন্দ্রীকরণ নিশ্চিত করে। কেবল স্থানিক বা জাতীয় রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ নয়; আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে ক্ষমতাধর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, উত্তর-আধুনিক বিশ্বে যাদের অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থা (যেমন বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ, ডাব্লিউটিও) বলা হয়, এক্ষেত্রে পুঁজিপতিদের স্বার্থে উমেদারি কেবল নয়, সক্রিয় চাপ প্রয়োগকারীর ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টো আইএমএফের চাপে ৩শ' কল-কারখানা বেসরকারিকরণ করেছিলেন ১৯৭৩ সালে। ১৩০০ আমদানি নিষিদ্ধ পণ্য নিজ দেশে ঢুকতে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশে জেনারেল জিয়া-এরশাদ কসমোপলিটন কর্তাদের সমর্থন পেতে ১৯৭০ ও ৮০'র দশকে দেদার বিরাষ্ট্রীয়করণ করেছিলেন। উপরন্তু, পুঁজিবাদের চলার পথ মসৃণ করতে গণতন্ত্র অনেক ক্ষেত্রে গণহত্যাকে অনুমোদন দিয়েছে। ঔপনিবেশিক ব্রাজিলে আখ ক্ষেতে কয়েক হাজার চাষীকে হত্যা করে ইনডেমনিটি পেয়েছিলেন প্রথম রকফেলার। দক্ষিণ আফ্রিকায় অসংখ্য গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়ে কৃষিভূমি দখল করেছিল ব্রিটিশরা। নৃ-বিজ্ঞানী এলিজাবেথ চোমাক দেখিয়েছেন, উপনিবেশিক রাষ্ট্রে দমন-পীড়নমূলক আইনের মাধ্যমে প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজের বীজ বপন করা হয়, যা পরে পুঁজিবাদের বিকাশকে নিশ্চিত করে।[৪৬] তালাল আসাদের (১৯৯২) অনুসিদ্ধান্ত, উপনিবেশিক সমাজে পাশ্চাত্যের আলোক-প্রাপ্ত রাষ্ট্রসমূহ ধ্বংস আর নির্মাণের যে সমান্তরাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে তাই অ-পশ্চাত্য সমাজে পুঁজিবাদের জন্ম দেয়।[৪৭]

তৃতীয়ত, পুঁজিবাদী শোষণ সমাজে যাতে মধ্যযুগীয়/সামন্ততান্ত্রিক বৈষম্য সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য গণতন্ত্র পুঁজিপতি ও গণমানুষের মধ্যে বিরোধ মিমাংসার ভূমিকা নেয়। বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী এ প্রকল্পেরই অংশ। পুঁজিবাদী সব রাষ্ট্রেই কম-বেশি সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি আছে। যুক্তরাষ্ট্রে মোট বাজেটের প্রায় ১৪ শতাংশ এ খাতের জন্য বরাদ্দ। বাংলাদেশে

শতাধিক সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি আছে, যা ২০২২ সালের মোট বাজেটের ১৪.০৭ শতাংশ। বস্তুত এ-সকল কর্মসূচির মাধ্যমে রাষ্ট্র বৈষম্য উদ্ভূত ব্যাপক গণ-অসন্তোষ বা বিপ্লব নস্যাৎ করে দেয়। 'সামাজিক নিরাপত্তা' কর্মসূচির মাধ্যমে সরকার পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। শিল্পের উপজাত হিসাবে যে বৈষম্যের উদগীরণ হয় রাষ্ট্র 'গণতান্ত্রিক ও কল্যাণময়ী'র ভূমিকা নিয়ে নিজে তা পরিষ্কার করে, যদিও প্রায়শই তা ব্যর্থ হয়। কেননা এসব সাহায্য রাজনৈতিক সমর্থক তৈরী করলেও বৈষম্য দূর করে না।

চতুর্থত, পুঁজিবাদ ছাড়া ধর্মীয় কিংবা স্বপোষী (subsistance) অথবা সমাজতন্ত্রী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েমের যে কোন চেষ্টা গণতন্ত্র রক্তপাত আর চরম সহিংস প্রক্রিয়ায় উৎখাত করে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনপ্রিয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামরিক-বেসামরিক আমলা আর পুঁজিপতির ত্রয়ী শক্তি জোটবদ্ধভাবে আঘাত করে ভিন্নমতকে। আপাত নিরীহ, নিরপেক্ষ গণতন্ত্র বিরোধী মত নির্মূলে মৌলবাদ (fundamentalism) থেকে কোন অংশে কম সহিংস নয়। সমাজতন্ত্রকে গণতন্ত্র মোল্লাতন্ত্রের মতোই দমন করে। চিলিতে আলেন্দে, বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আর ইন্দোনেশিয়ায় সুকর্ণকে হত্যার উদাহরণ কেবল নয়, আফ্রো-এশিয়া-ল্যাটিন আমেরিকার দেশে দেশে যুক্তরাষ্ট্র তৃতীয় বিশ্বের ক্যারিশমাটিক নেতাদের হত্যা করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ রুদ্ধ করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৪৮]

গণতন্ত্র কেন পুঁজিবাদকে সমর্থন করে?

বিষয়বস্তু, পরিধি ও ধারণাগত পার্থক্য সত্ত্বেও রাজনৈতিক মতবাদ হিসাবে গণতন্ত্র সুপ্রাচীন একটি মতাদর্শ। মানব সভ্যতার লিখিত ইতিহাসের প্রারম্ভিক পর্যায় থেকেই 'গণতন্ত্র' অন্তত শাব্দিক বিচারে রাজনৈতিক/শাসন প্রক্রিয়ার অনুসঙ্গ। উন্নত গ্রীসে হেরাডেটাস-প্লেটো-এরিস্টটলের লেখনীতে তো বটেই ইউরোপ কথিত 'বর্বর' এশিয়ায় গণতন্ত্রের বাস্তবিক প্রমাণ রয়েছে প্রাচীন যুগেও। মতাদর্শিক জগতে কেবল নয়; পূর্ব বাংলায় অষ্টম শতকে পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের রাজক্ষমতায় অধিষ্ঠান ছিলো নিখাদ গণতান্ত্রিক। গণতন্ত্র হচ্ছে বিশ্বে টিকে থাকা সবচেয়ে প্রাচীন রাজনৈতিক মতাদর্শ। তবে আধুনিক পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রের গণতন্ত্রের সঙ্গে প্রাচীন ও মধ্যযুগের গণতন্ত্রের কার্যকর পার্থক্য রয়েছে। গ্রীকের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ ছিলো ক্রীতদাস। পুরো মধ্যযুগতো বটেই শিল্প বিপ্লবেরও দু'শতাব্দী পর নারী ভোটাধিকার লাভ করে। অর্থাৎ পূর্বের গণতন্ত্র ছিলো কেবল অভিজাতদের, আরো সংক্ষিপ্ত পরিসরে ধনিক পুরুষের। সমসাময়িক বিশ্বে আমরা গণ-মানুষের ভোটাধিকার কেন্দ্রিক গণতন্ত্র বলতে যা বুঝি তা পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি। পুঁজিবাদের বিকাশই সারা বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এক্ষেত্রে দুটো বিষয় বিবেচনা জরুরি। প্রথমত, পুঁজিবাদ শুরুতে ছিল জাতীয়তাবাদী কারণ পুঁজির স্ফীতকরণ ও কেন্দ্রীকরণের জন্য তা জরুরি ছিল। নিজ রাষ্ট্রে অন্য দেশের পুঁজিপতির পণ্য প্রবেশে বাধা দান কিংবা নিষিদ্ধ করেই স্থানিক পুঁজিপতি গড়ে তোলে কল-কারখানা। মুনাফা বৃদ্ধিতে শ্রম শোষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ হলেও বণিক শ্রেণির প্রধান লক্ষ্য ছিল উৎপাদিত পণ্যের বাজার নিশ্চিত করা। তখন গণতন্ত্রও ছিলো জাতীয় রাষ্ট্রের বিষয়। দ্বিতীয়ত, স্থানিক পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী লুণ্ঠন আর কেন্দ্রীভবনের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক পুঁজিতে রূপান্তরিত হলে গণতন্ত্রও আন্তর্জাতিক প্রকল্পের অংশ হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিমা বিশ্ব পুঁজিবাদের চলার পথ মসৃণ করতে বিশ্বজুড়ে গণতন্ত্র রপ্তানি করে। বিভিন্ন সহায়তা প্রাপ্তির শর্ত হয়ে দাঁড়ায় গণতন্ত্র।[৪৯] অনেক ক্ষেত্রে বল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বে

সমাজতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করে। ল্যারি ডায়ামন্ড জানিয়েছেন, ১৯৭৪ সালে যখন গণতন্ত্রের তৃতীয় ঢেউ শুরু হয় তখন মাত্র ৪০ টি রাষ্ট্র ছিলো গণতান্ত্রিক, যার প্রায় সবকটি ছিলো পশ্চিমা বিশ্বের। পরবর্তী দুদশকের মধ্যে নির্বাচন কেন্দ্রিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ১১৭টিতে।[৫০]

সমসাময়িক বিশ্বে গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান আলোচক রর্বাট ডাল বলেছেন, 'পুঁজিবাদ ঐতিহাসিক ভাবে গণতন্ত্রের প্রাথমিক শর্ত।' *Democracy and Its Critiques* গ্রন্থে ডাল মন্তব্য করেছেন, গ্রীক নগর রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে শিল্পবিপ্লবোত্তর সাম্যমূলক পরোক্ষ গণতন্ত্র - সব ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ধনিকতন্ত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত। জোসেপ সুম্পিটার গণতন্ত্রের উত্থানের সঙ্গে পতনের বিষয়েও পুঁজিবাদের প্রাসঙ্গিকতার কথা বলেছেন। রাজনৈতিক-অর্থনীতির অন্যতম তাত্ত্বিক সুম্পিটার গণতন্ত্রের উদ্ভব আর বিকাশকে আলোচনা করেছেন পুঁজিবাদের উত্থান আর পুঁজিপতির ক্ষমতা গ্রহণের ভিত্তি ভূমিতেই।[৫১] অসংখ্য নজির তুলে নির্বিকার ভাবে বলেছেন: "history clearly confirms modern democracy rose along with capitalism, and is causal connection with it... modern democracy is a product of the capitalist process"।[৫২] কোন দ্বিধা না রেখেই সুম্পিটার বলেছেন, পুঁজিবাদের সভ্যতা (civilization of capitalism)'র রাজনৈতিক অংশ হলো গণতন্ত্র। কেননা চলতি বিশ্বব্যবস্থা, ক্ষমতা-কাঠামো, বিজ্ঞানের মায়াময় আবিষ্কার, সমুদ্র গতিপথ থেকে শুরু করে প্রাত্যাহিক জীবনের অনুষঙ্গ সব কিছুই সৃষ্টি করেছে পুঁজিপতির প্রণোদনা– উদ্যোগ। সুম্পিটারের ভাষায়:

> "Not only the modern mechanized plant and the volume of the output that pours forth from it, not only modern technology and economic organization, but all the features and achievements of modern civilization are, directly or indirectly, the products of the capitalist process. Airplanes, refrigerators, television and that sort of thing are immediately recognizable as results of the profit economy…modern medicine and hygiene would still be by-products of the capitalist process just as is modern education".[৫৩]

কাজেই আধুনিক যন্ত্রময় বিশ্ব, সম-সাময়িক শিক্ষা ব্যবস্থা এমনকি জীবনরক্ষাকারী ওষুধের ক্যারিশমা সব কিছুরই নির্মাতা পুঁজিপতি। পুঁজিপতিদের বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠন সরাসরি গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। পুঁজিবাদ রাষ্ট্রে শিক্ষা এবং গণমাধ্যমের যে বিকাশ ঘটায় তা গণতন্ত্রকে পুষ্ট করে। সংগতকারণেই উদারনৈতিক জীবনধারা, বহুত্ববাদী রাজনৈতিক সংস্কৃতি সৃষ্টি এবং সমাজের প্রতিটি স্তরে মুক্ত প্রতিযোগিতার চর্চার সুযোগের সঙ্গে পুঁজিবাদ সম্পর্কিত। এসব আবার গণতন্ত্রকে বাস্তবিক এবং শক্তিশালী করে দেয়।

গণতন্ত্র কেবল বাজার অর্থনীতি আর ব্যক্তিগত সম্পত্তির পুঞ্জিভূতকরণের সুযোগ সৃষ্টির মধ্যেই কার্যকর হতে পারে। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা জরুরি রাজনৈতিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য। সামন্ততান্ত্রিক, মোল্লাতান্ত্রিক, সমাজতান্ত্রিক কিংবা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত বিধিব্যবস্থা/ ফ্যাসিজমে গণতন্ত্র নির্বাসিত হতে বাধ্য। বিশ্বের সমস্ত পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রই গণতান্ত্রিক; সমস্ত গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নিখাদ পুঁজিবাদী। বিপরীতক্রমে ইউরোপের মতো যেখানে বিকশিত পুঁজিবাদ নেই, সেখানে গণতন্ত্রও নেই। সামন্ততান্ত্রিক বা ধর্মতান্ত্রিক কর্তত্ববাদী কাঠামো যেখানে পুঁজিবাদ বিনাশ করতে পারেনি সেখানে বিভিন্ন নামে ওইসব ক্ষমতা-কাঠামোর সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিবর্গই রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা

করছে। মধ্যপ্রাচ্যে রাজতন্ত্র, আফ্রিকায় গোত্রতন্ত্র আর এশিয়ার দেশে দেশে বিভিন্ন ছদ্মনামে 'প্রাগ-ঐতিহাসিক স্বৈরতন্ত্র' রাষ্ট্র পরিচালনার প্রধান শক্তি।

পুঁজিবাদের বিকাশের তিনটি প্রধান ধারায় গণতন্ত্রের অগ্রযাত্রাকে বিশ্লেষণ করেছেন বেরিংটন মুর। তাঁর মতে, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে পুঁজিবাদের ভিন্ন বিকাশপথ এবং সেই পথে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনের সূত্র ধরে পুঁজিবাদের সঙ্গে বিকশিত হয়েছে গণতন্ত্র।[৫৪] *প্রথমত*, সামন্ততন্ত্রের উপযোগিতায় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, যুক্তরাষ্ট্র, হল্যান্ডে ভূমি কেন্দ্রিক উদ্বৃত্ত আয়ের মধ্যে দিয়ে একটি ছোট কিন্তু ক্ষমতাশালী বণিক সম্প্রদায় (commercial bourgeoisie)'র উদ্ভব ঘটে। ইউরোপ-আমেরিকায় তারাই নেতৃত্ব দেয় শিল্প বিপ্লবের। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে এই বণিক সম্প্রদায় আইন সভার কর্তৃত্ব গ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক বিধি-ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। *দ্বিতীয়ত*, জার্মানী ও জাপানে পুঁজিবাদের বিকাশ প্রাগুক্ত পরিশুদ্ধ পথে হয়নি। ভূমিকেন্দ্রিক অভিজাত শ্রেণি বণিক সম্প্রদায়ের উপর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। বস্তুত ক্ষমতা কাঠামোর এই দুই প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী নিজেদের আপোষ-রফা ও রূপান্তরের মধ্যদিয়ে শিল্প বিপ্লবের জন্ম দেয়। কিন্তু সামরিক-রাজতান্ত্রিক কর্তৃত্ব কাঠামোকে তারা উপরে ফেলতে কিংবা চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনি। বরং প্রবল পরাক্রমশীল রাজতন্ত্র এসব অঞ্চলে সরাসরি শিল্প স্থাপন ও আধুনিকীকরণের মাধ্যমে পুঁজিবাদের নামে চরম কর্তৃত্ববাদী রাষ্ট্রকেন্দ্রিক ফ্যাসিজমের জন্ম দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিকশিত ওই ফ্যাসিজমই রূপান্তরিত হয় গণতন্ত্রে। *তৃতীয়ত*, পুঁজিবাদের বিকাশের তৃতীয় পথটি বৈপ্লবিক ও সহিংস, যা সাধিত হয়েছে সোভিয়েত রাশিয়া বলকান অঞ্চল ও গণচীনে। মুরের মতে, রাশিয়ায় বণিক সম্প্রদায় এতটাই দুর্বল ছিল যে, তারা শিল্পের আধুনিকীকরণে নেতৃত্ব দিতে পারেনি। অক্ষমতার এ প্রেক্ষাপটে ক্রীতদাস তুল্য প্রান্তিক কৃষকদের (সার্ফ) হতাশাকে পুঁজি করে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন বণিক সম্প্রদায়ের বিপ্লবী অংশ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। জন্ম দেয় রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতি তথা সমাজতান্ত্রিক কর্তৃত্ব কাঠামোর। রাশিয়াসহ বলকান অঞ্চলে সমাজতন্ত্র শিল্প স্থাপন ও আধুনিকীকরণে সফল হলেও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও হতাশার জন্ম দেয়। শিল্পের অনিবার্য পরিণতি হিসাবে কমিউনিজম এ অঞ্চলে গত শতকের শেষ দশকে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থা হিসাবে কার্যত বিদায় নেয়; প্রতিষ্ঠিত হয় ব্যক্তি মালিকানার গণতন্ত্র।

উপরের আলোচনা হতে স্পষ্ট, অগ্রসর ইউরোপ এবং আমেরিকায় পুঁজিবাদের সঙ্গে গণতন্ত্র কাঠামোগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বিপরীতক্রমে, যেখানে পুঁজিবাদ তার পূর্ণরূপ এবং স্বকীয়তা নিয়ে আবির্ভূত হতে পারেনি সেখানে গণতন্ত্র অনুপস্থিত ছিলো। এর সহজ অর্থ হলো, আধুনিক গণতন্ত্র পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতি ছাড়া এর বিকাশের পথ অনিশ্চিত। তিন শতাব্দী আগে পুঁজিবাদী শ্রেণী ছিলো সমাজ ও রাষ্ট্রের বিপ্লবী শক্তি। তারা (স্বাধীন কৃষক, বণিক, ক্র্যাফটম্যান) সামন্ত্রতন্ত্র-চার্চ-রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলো প্রতিনিধিত্বশীল সরকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতাসহ অন্যান্য গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবিতে। ক্ষুদ্র তবে শক্তিশালী মধ্যবিত্তিক সেই পুঁজিপতি শ্রেণি একইসঙ্গে নেতৃত্ব দেয় রাজনৈতিক দল গঠনে, নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবনের মাধ্যমে শিল্প-বিপ্লবের, ধর্মীয় সংস্কার-উদারতাবাদের প্রসারসহ রাজতন্ত্রের রক্তাক্ত উচ্ছেদ প্রক্রিয়ায়। তবে উপনিবেশের ঐতিহ্যবাহী তথাকথিত তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্রের বিকাশ প্রাগুক্ত পথে হয়নি। সরাসরি সামরিক দখল-দারিত্ব, বণিকদের পুঁজি লুণ্ঠন আর উপনিবেশিক শক্তির দেশীয় লাঠিয়াল (যারা অভিজাত বলে কথিত) এর সমর্থনে স্থানিক আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-পারিবারিক কাঠামো ভাঙ্গনের মধ্য দিয়ে ভারত-আফ্রিকা-ব্রাজিলে পুঁজিবাদের স্ফূরণ ও স্ফীতকরণ।

গণতন্ত্র ও আইন এক্ষেত্রে ছিলো দুই অ-ব্যর্থ হাতিয়ার। বস্তুত এসব অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক ও স্ব-পোষী (subsistence) অর্থনীতির শক্ত খোলশ স্থানিক চাহিদা, জনদাবি বা বিবর্তনের দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় ভাঙ্গেনি। ভেঙেছে জন ডায়ারের কামানের গোলায়, কর্ণওয়ালিসের পীড়নমূলক ভূমি ব্যবস্থায় এবং আফ্রিকা-ল্যাটিন আমেরিকায় শত শত হত্যা-জিঘাংসার ইনডেমনিটির কল্যাণে। তৃতীয় বিশ্বে পুঁজি গঠিতই হয়েছে রক্তাক্ত প্রক্রিয়ায়; সে কারণে গণতন্ত্রও এখানে রক্তাক্ত।

গণতন্ত্র বাজার কেন্দ্রিক অর্থনীতি ছাড়া সুসংগঠিত ও সফল হতে পারে না। যদিও গণতন্ত্রের জন্য বাজার অর্থনীতি একমাত্র শর্ত নয়, তবে প্রথম শর্ত। গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ, ব্যক্তি অধিকার, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা, এক ব্যক্তি এক ভোট, নারীর ক্ষমতায়ন, গণমাধ্যমের বিকাশ– সবকিছুই পুঁজিবাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এক্ষেত্রে পিটার বার্জারের দুটি অনুকল্প খুবই কার্যকর আন্তঃসম্পর্ক নির্দেশ করে। প্রথমত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি অর্থনীতিতে কড়া হস্তক্ষেপ করে তবে গণতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়; প্রতিষ্ঠিত হয় কর্তৃত্ববাদ । দ্বিতীয়ত, সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র যদি অর্থনীতিতে উদারীকরণ শুরু করে তবে সমাজতন্ত্র বাতিল হয়ে এক পর্যায়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।[৫৫] ১৯৯১ সালে পেরেস্ত্রইকা ও গ্লাসনস্ত্রর কল্যাণে পরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলুপ্তির মধ্য দিয়ে ১৫ টি রাষ্ট্রের অভ্যুদয় এই অনুকল্প নিশ্চিতভাবে প্রমাণ করেছে। কাজেই গণতন্ত্র এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পৃক্ত যা বাজার ও মুনাফা কেন্দ্রিক। আর এ কারণেই গণতন্ত্র নিজের প্রাতিষ্ঠানিকতার জন্য পুঁজিবাদকে সমর্থন করে। ফ্রান্সিস ফুকুয়ামার ভাষায়-

> "The relationship between capitalism and democracy is an indirect one. That is, capitalism in itself does not generate direct pressures for democracy. It is perfectly compatible with many forms of authoritarianism (though obviously not with communist totalitarianism), and may even flourish better in nondemocracies. But capitalism is a more efficient engine of economic growth than socialism, and thus is more likely to generate the rapid socioeconomic change that favors the emergence of stable democracy". [৫৬]

সামাজিক গতিশীলতার ধারণা দিয়ে ১৯৫০ ও '৬০-এর দশকে ডানিয়েল লার্নার (১৯৫৮), লিপসেট (১৯৫৯) প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী বলেন, গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের সঙ্গে মাথাপিছু জিএনপির জোরালো সম্পর্ক রয়েছে। কেবল তাদের মত আর পরিসংখ্যানিক প্রমাণ নয়; সাধারণ যৌক্তিকতা এ দুটি চলকের সম্পর্ক নির্দেশ করতে যথেষ্ট। কেননা অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত জাতিগোষ্ঠীর স্বাক্ষরতার হার, পুষ্টিমান, গণমাধ্যম ব্যবহারের মাত্রা, মনঃস্তাত্ত্বিক গতিশীলতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, নারীর ক্ষমতায়নসহ জনগণের সার্বিক জীবন-মান উন্নয়ন। লিপসেটের মতে, গণতন্ত্র রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। সুনির্দিষ্টভাবে, এর অর্থ হল যে একটি জাতি যত বেশি ভাল করবে, তার গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা তত বেশি। অ্যারিস্টটলের প্রাচীন গ্রীস থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত, ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, শুধু একটি ধনী সমাজে যেখানে অপেক্ষাকৃত কম নাগরিকই প্রকৃত দারিদ্র্যের মধ্যে বসবাস করতে পারে এমন একটি পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে জনসংখ্যার জনগণ বুদ্ধিমত্তার সাথে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে পারে এবং প্রয়োজনীয় আত্মসংযম গড়ে তুলতে পারে। দায়িত্বজ্ঞানহীন রাজনৈতিক নেতাদের আবেদনের কাছে নতি স্বীকার করা এড়িয়ে চলতে পারে। "একটি বৃহৎ

দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং একটি ছোট অভিজাত শ্রেণীতে বিভক্ত একটি সমাজের পরিণতি হলো অলিগার্কি বা কতিপয়ের স্বেচ্ছাচারী শাসন"।[৫৭] এরিস্টটলের মতো আধুনিককালে লিপসেট গণতন্ত্রের উদ্ভব এবং বিকাশের জন্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্ফীতকরণে জোর দিয়েছেন। ইউরোপ, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ টেনে লিপসেট লিখেছেনঃ "these were the land in which the bourgeoisie were strongest, education most widespread, the centreal state weakest"।[৫৮] বেরিংটন মুর-এর অনুসরণে লিপসেট লিখেছেন, গণতন্ত্র ছাড়া পুঁজিপতি টিকতে পারে না, আবার পুঁজিপতি ছাড়া গণতন্ত্রের উদ্ভব হয় না। শ্লোগানের আদলে তিনি লিখেছেন ' *No Borrgeois, No Democracy*'। গণতন্ত্রে মধ্যবিত্তের অপরিহার্যতার যৌক্তিকতা তুলে লিপসেট লিখেছেন-"a society with a large middle class, particularly a self employed middle class, is more likely to foster democracy, to seek to inhibit state power and to accept political competition as legitimate, than one with extreme hierarchical differences."[৫৯]

পুঁজিবাদের সম্প্রসারণ কেবল জোরপূর্বক পন্থায় গণতন্ত্রের প্রসার আর স্থায়ীকরণ করে না। পুঁজিপতির সৃজনশীল উদ্যোগ আর আবিষ্কার ব্যক্তিকে বিমোহিত করে। ভোগবাদী আদর্শের চমৎকার বিজ্ঞাপন আর জ্ঞান জগতে জাতীয়তাবাদ, আন্তর্জাতিকতাবাদ, বিশ্বায়ন, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদ প্রভৃতি দর্শনের প্রচার করে পুঁজিবাদ ব্যক্তির মনঃস্বত্ত্ব গণতন্ত্রের পক্ষে গড়ে দেয়। এ প্রেক্ষপটেই খোদ কার্ল মার্কসের বিপ্লবের 'ভ্যানগার্ড' প্রলেতারিয়েত শ্রমিক নিজেদের নিস্পৃহ হিসাবে আবিষ্কার করেন। জীবনক্ষয়ী বিপ্লবকে তারা বর্ণনা করেন 'অহেতুক উৎপাত' হিসাবে। এলেক্স ইনকেলেস এবং ডেভিড স্মিথ ছয়টি পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কয়েক হাজার শ্রমিকের সাক্ষাৎকার নিয়ে জানিয়েছেন, সংস্কৃতিগত ভিন্নতা থাকলেও এসব রাষ্ট্রের শ্রমিকরা বুর্জোয়া মতাদর্শ (নিস্পৃহতা, অংশগ্রহণমূলক রাজনীতি, অবাধ প্রতিযোগিতা) ধারণ করে।[৬০] তারা বিপ্লবের মাধ্যমে 'সর্বহারার একনায়কত্ব' প্রতিষ্ঠার মতাদর্শে বিশ্বাসী নয়। তাদের গবেষণার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পাঠ হলো– পুঁজিবাদ খোদ শোষিত শ্রমিকের মধ্যেও বিপ্লবের তাগিদ নস্যাৎ করে দিয়ে প্রলেতারিয়েতের মনঃস্বত্ত্ব গণতন্ত্রের প্রতি আগ্রহী করে তোলে। মনে রাখা জরুরি, কমিউনিস্ট বিপ্লব যেসব রাষ্ট্রে সম্পন্ন হয়েছে তার কোনটি পুঁজিতান্ত্রিক রাষ্ট্র ছিলো না। রাশিয়া-চীন-ভিয়েতনাম প্রাক-পুঁজিবাদী অথবা আধা-সামন্ততান্ত্রিক স্তর থেকে সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। কাজেই পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের শ্রম শোষণের প্রেক্ষাপটে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নিজেকে রূপান্তরের নজির চলতি বিশ্বে নেই। রশিয়ায় ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লব সাধিত হয় কৃষক-শ্রমিক-জনতার সম্মিলিত প্রয়াসে। কার্ল মার্কস কথিত বিপ্লবে শ্রমিকদের অগ্রণী ভূমিকা সম্পর্কে পুরোপুরি আস্থা ছিলনা ভ্লাদিমির লেনিনের। তিনি 'কমিউনিস্ট পার্টি'র ধারণা দিয়ে বলেন, বিপ্লবের ভানগার্ড হবে কমিউনিস্ট পার্টি। চীনে মাও জে-দং এর সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের প্রধান শক্তি ছিল ক্ষুদ্র-কৃষক। সমসাময়িক বিশ্বে চীন শিল্পোন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদা পেয়ে জি-সেভেন ভুক্ত রাষ্ট্রের কাতারে দাঁড়াতে পারেনি। আর ভিয়েতনাম এখনো প্রধানত কৃষিনির্ভর সমাজ/রাষ্ট্র।

লিপসেট মধ্যবিত্তের বিকাশে পুঁজিবাদের ভূমিকা বিশ্লেষণ করেনি। তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, মধ্যবিত্তের বিকাশে মূল ভূমিকা পালন করে পুঁজিবাদই। বস্তুত শিল্প বিপ্লবের আগে কার্যকর ও স্ফীত মধ্যবিত্তের দেখা পায়নি কোন রাষ্ট্রই। শিল্প-কারখানা কেন্দ্রিক অর্থনীতিকে ঘিরে গড়ে ওঠে বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান। প্রশাসনিক বিধি ব্যবস্থা। প্রসার ঘটে শিক্ষার। পুঁজির নিরাপত্তায় নতুনভাবে সাজানো হয় পুলিশ আর সেনাবাহিনী। নতুন চিন্তা ব্যাপকভাবে প্রসার ঘটায় সাহিত্য-

সংস্কৃতির। নতুন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের উদ্ভবের ফল হিসাবে বিকাশ ঘটে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির। তাই পুঁজিবাদ কেবল বুর্জোয়া নয়, মধ্যবিত্তেরও ধাত্রী। মধ্যবিত্তের বিকাশ ঘটিয়ে পুঁজিবাদ অনিবার্য করেছে গণতন্ত্রের বিকাশও। গণতন্ত্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিশেষত মাথা পিছু আয়ের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। লিপসেটের মতোই, অ্যাডাম প্রজেওরস্কির বলেছেন, দরিদ্র রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা কম, মধ্যম আয়ের রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভবনা অনেক বেশী।[৬১] মানব সমাজের লিখিত ইতিহাস জানান দিচ্ছে, এক হাজার ডলারের নিচে আয়কারী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ। অনদিকে তিন হাজার থেকে ৬ হাজার ডলারের মধ্যে আয়কারী রাষ্ট্রে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা মাঝারি। আর ৬ হাজার ৫৫ ডলারের উপর মাথাপিছু আয়ের রাষ্ট্রে গণতন্ত্র অনেকটাই নিরাপদ।[৬২] কেবল প্রতিষ্ঠা নয়, গণতন্ত্র স্থায়ীকরণের সঙ্গেও পুঁজিবাদ তথা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও মাথাপিছু আয় সরাসরি সম্পর্কিত। প্রজেওরস্কি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন নিম্নোক্তভাবে:

> "We know that democracies are frequent among the economically developed countries and rare among the very poor ones. The paths to democracy are varied. Indeed, they seem to follow no predictable pattern. But once democracy is established, for whatever reasons, its survival depends on a few, easily identifiable, factors. Foremost among them is the level of economic development, as captured by per capita income.[৬৩]

গণমাধ্যম, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ: ভোগবাদের বিকাশ

পুঁজিবাদী সংস্কৃতির বিকাশের কেন্দ্রে রয়েছে ভোগবাদের স্ফূরণ। উৎপাদক পুঁজিপতির পক্ষে ভোগবাদের বিকাশ ঘটায় গণমাধ্যম। গণমাধ্যম সম্মোহনী ক্ষমতা আর বহুমুখী সূক্ষ্ম প্রচার-প্রচারণা দ্বারা অনবরত সৃষ্টি করছে 'অপ্রয়োজনের প্রয়োজন'। পুঁজিপতির মুনাফা বৃদ্ধির জন্য তা জরুরি, কেননা ভোগবাদের প্রসার ভোক্তার সংখ্যা বাড়ায়, ভোক্তা হয়ে পড়ে আধুনিক তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আবশ্যিক গ্রাহক।[৬৪] ভোক্তারূপী আধুনিকতার আবশ্যিক গ্রাহকরা পুঁজিবাদ আর গণমাধ্যমের সমার্থক কেবল নয়, সেবাদাসে পরিণত হয়। গণতন্ত্র যেহেতু গণমাধ্যমের অবাধ স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেয় সেহেতু ভোক্তা গণতন্ত্রেরও গ্রাহক।

গণমাধ্যম বিজ্ঞাপন, নাটক, সিনেমার মাধ্যমে সমাজে ভোগবাদী সংস্কৃতি গড়ে তোলে। রাষ্ট্র-সমাজ তো বটেই, নিজ চেতনা থেকেও ব্যক্তি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। বিচ্ছিন্নতার সামাজিক-সাংস্কৃতিক পাটাতন রাজনৈতিক অসাম্যকে দৃঢ় ভিত্তি দান করে। বিপ্লবের জন্মগত অধিকারচ্যুত হয়ে ব্যক্তি পুঁজিবাদী গণতন্ত্র (capitalist democracy)'র বিমুগ্ধ দর্শক আর গ্রহীতায় রূপান্তরিত হয়। পুঁজিবাদী গণতন্ত্রে ব্যক্তির অবস্থান/অংশগ্রহণ কেবল ভোটদান আর পণ্য ক্রয়ে। তবে এক্ষেত্রেও সে স্বাধীন নয়; ভোট দানের ক্ষেত্রে ব্যক্তি কেবল স্থিরকৃত বিকল্প (সম্পদশালী প্রার্থী) পছন্দ করে। অন্যদিকে পণ্যক্রয়ে ব্যক্তির চাহিদা, পছন্দ-অপছন্দ গণমাধ্যম সৃষ্টি করে নির্দিষ্ট পণ্যের 'ব্রান্ডিং'- এর মাধ্যমে। দেশ-কাল-সংস্কৃতি ভেদে ভোক্তার মনোভূমিতে গণমাধ্যম খোদাই করে দেয় চলতি ব্রান্ডের নাম, হাল ফ্যাশন কিংবা পুরানো পণ্য বাতিল করতে লাগিয়ে দেয় 'আধুনিক' কিংবা 'সেকেলে' তকমা। ভোগ চাহিদার সঙ্গে গণমাধ্যম বিনির্মাণ করে রাজনৈতিক মতাদর্শ। 'কালচারাল ইন্ডাস্ট্রি' হিসাবে গণমাধ্যম সংস্কৃতির উৎপাদন, পুনরুৎপাদন ও বিতরণ করে। ব্যাপক প্রবেশগম্যতার ক্ষমতায় টেলিভিশনের ক্ষমতা এখানে সব থেকে বেশি। কেননা নেপলিয়ান বলেছেন, "চারটি শত্রু ভবাপন্ন

সংবাদপত্র হাজার বেয়নেটের চেয়ে বেশি ভয়ংকর"।[৬৫] গণমাধ্যম নির্মিত মতাদর্শ সংগতকারণেই গণমাধ্যমের মালিক তথা পুঁজিবাদের বিরোধী নয়। বস্তুত গণমাধ্যম নিজের জীবন-মরণ-প্রসার-জনপ্রিয়তার জন্য পুঁজিবাদ আর গণতন্ত্রের পক্ষে অবস্থান নেয়। এডওয়ার্ড হারম্যান ও নোয়াম চমস্কি এ প্রেক্ষাপটেই *ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট* গ্রন্থে বলেছেন, শক্তিমানেরা নিজেদের প্রয়োজনে 'সম্মতি' আদায় করতে পারে, এমনকি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে ব্যক্তির চিন্তা আর কল্প-জগতও।[৬৬] গণমাধ্যমের সর্বব্যাপী বিন্যস্ত এ ক্ষমতা অবশ্যই পুঁজিবাদের বিরোধী শক্তি হিসাবে আবির্ভূত হয় না; কেননা গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠানগুলো বর্তমানে পুঁজিরই (পুঁজিপতির) শিল্প। স্ব-পুঁজির নিরাপত্তার স্বার্থেই গণমাধ্যম সরাসরি অবস্থান নেয় গণতন্ত্রের পক্ষে। গণতন্ত্র বাদে আর সব মতবাদ পুঁজিপতি নিয়ন্ত্রিত গণমাধ্যমে স্বৈরচারী, জঙ্গীবাদী, নিপীড়নমূলক কিংবা মানবতা-বিরোধী। এই প্রেক্ষাপটে আরেকটি প্রশ্ন সয়ম্ভু ক্ষমতা নিয়ে দৃশ্যমান হয়–গণমাধ্যম প্রচার করে বলেই মানুষ তা বিশ্বাস করে কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হবে, প্রথমে মুদ্রণ যন্ত্রের প্রসার এবং আরো পরে তরঙ্গায়িত (ইলেকট্রনিক্স) গণমাধ্যমের বৈপ্লবিক ও মনোজাগতিক ক্ষমতার ভিত্তি মূলে।

মুদ্রণ যন্ত্রের আবিষ্কার আর ছাপার হরফ সমজাতীয় সমাজ গঠনে মূল ভূমিকা রেখেছে। বেনডিক্ট এন্ডারসনের মতে, মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কারের কল্যাণে তৈরি হয় কল্পিত জনসমষ্টি (imagined community)। ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি, জীবনাচরণ, আর্থ-সামাজিক হতাশা/প্রত্যাশা সবকিছুকে কেন্দ্র করে ছাপার হরফই মানুষের মগজে বপণ করে জাতীয়তাবাদের বীজ। একইসঙ্গে চিন্তার বলয়ে নিয়ে আসে 'অন্যজাতি', 'বর্বর গোষ্ঠী'র ধারণা। জাতি 'কল্পিত, কেননা ক্ষুদ্রতম জাতির সদস্যরাও কখনো তাদের অধিকাংশ সদস্যদের চেনেনা অথচ প্রত্যেকের মনোজগতে তাদের প্রতিচ্ছবি ও যোগাযোগের ধারণা বিরাজমান।[৬৭] কল্পিত এ বোধ (জাতীয়তাবাদ) ভাষা আর ছাপার হরফের ক্ষমতায় চার্চের ক্ষমতা সীমিত করে। সনাতনী শাসকদের হঠিয়ে বণিকগোষ্ঠীর শাসন প্রতিস্থাপিত করে। মুদ্রণযন্ত্রের কল্যাণে প্রতিস্থাপিত নতুন শক্তি নিজের ক্ষমতাকে বৈধতা দেয়। অ্যান্ডারসন এই প্রক্রিয়ার নাম দিয়েছেন 'মুদ্রণ পুঁজিবাদ'–যা একাধারে জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করে এবং শাসককে বৈধতা দেয় নিজ জনগোষ্ঠীকে শাসনের, দখলের।[৬৮] গ্রামসি এক্ষত্রে হেজিমনিক ক্ষমতা ধারণার বিকাশ ঘটিয়ে আমাদের জানিয়ে দেন, গণমাধ্যমের কল্যাণে আধুনিক রাষ্ট্র দখল করে ব্যক্তির মনোজগত। আর সেই সূত্র ধরে সম্মতি আদায়ের মাধ্যমে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র প্রবল পরাক্রমশালী মুঘল বা জার শাসকের চেয়েও বেশি ক্ষমতা নিয়ে নিয়ন্ত্রণ করে ব্যক্তি ও সমাজ জীবন।

জাতীয়তাবাদের বোধ ছাড়া পুঁজির গঠন ও স্ফীতকরণ প্রায় অসম্ভব ছিল। কেননা প্রাক-পুঁজিবাদী সমাজে জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়েই অন্য রাষ্ট্রের পণ্য নিষিদ্ধ করা হয়। জাতীয়তাবাদের নামেই যুদ্ধের ময়দানে লাখ লাখ তরুণ জীবন উৎসর্গ ও হরণ করে। সম্মোহিত এ বোধে কবিতা, গান, শোকস্তব, বীরত্বের প্রচার, নাটকসহ সৃষ্টিশীল কর্ম মহাপ্লাবনের মতো ছড়িয়ে পড়ে। আলোকয়ান যুগের পর এসব সৃষ্টিশীল কর্ম আর ব্যক্তি উদ্যোগ নেতৃত্ব দেয় শিল্প বিপ্লবের। পুঁজিপতির পক্ষে গণমাধ্যমের ক্যারিশমা (জাতীয়তাবাদ গঠন) এখানেই থেমে থাকেনি; উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র কিংবা উত্তর-আধুনিক যুগে পণ্য চাহিদা তৈরি করে গণমাধ্যমই পুঁজির স্ফীতকরণে সনাতনী বারুদের ভূমিকা আত্মস্থ করেছে। পণ্যের উৎপাদন বাজারজাতকরণের (বা ক্রতাকে কিনতে বাধ্য করা) চেয়ে ঢের ঢের সহজ। বস্তুত গণমাধ্যমের বিজ্ঞাপন ধাপে ধাপে পণ্যের পক্ষে মানুষের মনঃস্তত্ব পরিগঠন করে। প্রথমে তা কল্পজগতে দৃশ্যমান হয়, তারপর নানা ইমেজে

আচ্ছন্ন করে ব্যক্তির মধ্যে দুর্দমনীয় চাহিদার জন্ম দেয়, ব্যক্তিকে বাধ্য করে পণ্যটির অনিবার্য ক্রেতা হতে। যেমনটা ভোক্তারা সাধারণত বর্ণনা করেঃ "আমি একটি প্রয়োজনীয় পণ্যেও কল্পনা করতে পারি, তাই আমি এটি চাই। আমি সেটা চাই, তাই আমার ওটা থাকা উচিত। আমার পণ্যটি থাকা উচিত, কারণ আমার ওটা দরকার। যেহেতু আমার পণ্যটি দরকার, তা আমার প্রাপ্য। পণ্যটি যেহেতু আমার প্রাপ্য, তা পাওয়াার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু আমি করব"।

বস্তুত আধুনিক যুগে মানুষ আর চোখের দেখাকে বিশ্বাস করে না, যতক্ষণ না তা ছাপার অক্ষরে জানান দেয়; বেতারে টেলিভিশনে ঘোষণা আসে। মানুষের চিন্তাজগৎ কল্পিত ছবি তৈরির কারখানা এবং সেখানে ব্যক্তি নিজের জগৎ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। কিছু শ্রুতি, কিছু চলমান দৃশ্য, কিছু স্পর্শ ইন্দ্রিয়জাত বোধ এবং তার সঙ্গে অভিজ্ঞতার মিশ্রণে সে পরিবেশ সম্পর্কে মনোভাব, ভাল-মন্দ কিংবা পছন্দ-অপছন্দের তালিকা করে নেয়। অর্থাৎ আমাদের চেনা-জানা পৃথিবী, দেখার ধরন, কল্পজগত, এমনকি বাস্তব জগতেরও মালিক কিংবা নির্মাতা গণমাধ্যম।

পুঁজিবাদ, গণতন্ত্র এবং গণমাধ্যমের মিথস্ক্রিয়াঃ আলোচনা এবং গবেষণা ফলাফল

ফিরে আসি প্রবন্ধের মূল প্রশ্নে, 'পুঁজিবাদ কেন রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসাবে গণতন্ত্র কায়েম করে এবং গণতন্ত্র কেন পুঁজিবাদকে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে পছন্দ করে?' পুঁজিবাদ এবং গণতন্ত্রের মিথস্ক্রিয়ায় গণমাধ্যমের ভূমিকা কী? এই প্রশ্নের উত্তর রয়েছে দুটি আদর্শের জন্ম, বিকাশ, স্থায়িত্ব এবং নিরাপত্তা হুমকির মধ্যে। এই সেকশনের প্রথম ভাগে আমি পুঁজিবাদ কেন গণতন্ত্রের অনুগামী তা ব্যাখ্যা করবো এবং দ্বিতীয়ত অংশে ব্যাখ্যা করবো কিসব বিষয় গণতন্ত্রকে বাধ্য করে পুঁজিবাদের সঙ্গে জোটবদ্ধ হতে। সবশেষে, গণতন্ত্র, পুঁজিবাদ এবং গণমাধ্যমের মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করবো।

রাজতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র কিংবা সমাজতন্ত্র পুঁজির নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। কেননা এগুলো নিজেরাই এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা আরোপ করে পুঁজিপতিদের বিনাশ সাধনে তৎপর হয়। অপরদিকে গণতন্ত্র প্রধানত রাজনৈতিক মতবাদ, যদিও তা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত। ব্যক্তি মালিকানা, সম্পদ স্ফীতকরণ-পুঞ্জিভূতকরণ, অবাধ প্রতিযোগিতা আর উৎপাদনে রাষ্ট্রের অংশীদারীত্বহীনতার (বিরাষ্ট্রীয়করণ) কথা প্রচার করে গণতন্ত্র পুঁজিবাদের পক্ষেই অবস্থান নেয়। সহজ কথায় গণতন্ত্র মার্কেট ব্যবস্থা বা উৎপাদন-বন্টনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেনা এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণে পুঁজিপতিদের অটোনমি স্বীকার করে। একদিকে গণতন্ত্র দেয় পুঁজির সুরক্ষা ও পুঁজিপতিদের স্বায়ত্ত্বশাসন আর অন্যদিকে তা ভোগবাদী আদর্শ-বিজ্ঞাপন প্রচার করে বিকাশ ঘটায় জাতীয় পুঁজির যা পরে রূপান্তরিত হয় আন্তর্জাতিক পুঁজিতে। দ্বিতীয়ত, ভোক্তা-উৎপাদক সম্পর্কের বহুমুখীকরণ ও বিস্তৃতকরণের ওপর নির্ভর করে গতিশীল পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের বিকাশে মধ্যবিত্ত আর স্ফিত ভোক্তা শ্রেণি জরুরি। রাজতান্ত্রিক-সামন্ততান্ত্রিক সামাজিক কাঠামো (সামাজিক স্তর বিন্যাস) ভোক্তা শ্রেণির বিকাশে বাধা দেয়। গণতন্ত্র মধ্যবিত্ত তথা ভোক্তা শ্রেণির বিকাশে সক্ষম হাতিয়ার। কেননা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে গণমাধ্যম পূর্ণ স্বাধীনতা নিয়ে জনগণের মনোজগতে ভোগের চাহিদা উৎপাদন ও পুনরোৎপাদন করে।

তৃতীয়ত, পুঁজিবাদের বিকাশে জবরদস্তির কার্যকর ভূমিকা রয়েছে, তবে তা মুখ্য নয়; মুখ্য ভূমিকা রাখে ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তি আর অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে সম্পদ ও মুনাফা বৃদ্ধির দুর্বিনীত

লোভ। গণতন্ত্র ছাড়া অন্যান্য শাসন ব্যবস্থা কৃত্রিম ও জন্মগত অন্যান্য সামাজিক স্তর বিন্যাস চাপিয়ে দিয়ে ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তি নষ্ট করে দেয়। আর এ কারণে পুঁজিবাদ বর্ণবাদ কেন্দ্রিক ধর্মতন্ত্র, নারীকে অন্তরীণ রাখার গোড়ামিপূর্ণ সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, ভূমি কেন্দ্রিক সামন্ততন্ত্র বা মুনাফার স্বীকৃতিহীন সমাজতন্ত্রের ঘোর বিরোধী। চতুর্থত, গণতন্ত্র দ্রুতই পুঁজিবাদের মতো অভিযোজনে সক্ষম, এটি ধর্মতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের মতো কট্টর মতাদর্শ নয়। গণতন্ত্রের প্রচারিত মতাদর্শে আছে স্ব-বিরোধিতা। স্ব-বিরোধিতার মুখোশ গণতন্ত্রকে আপাত নিরপেক্ষ রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে জনমনে প্রতিষ্ঠিত করে। গণতন্ত্রের শান্তিপূর্ণ ভাবমূর্তি ভিন্নমতাদর্শ দমন-পীড়নে খুবই সহায়ক। পঞ্চমত, পুঁজিপতি শ্রেণি ‘অবাধ প্রতিযোগিতা’ আর ‘ভোটের স্বীকৃতি’ নিয়ে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ, আইন বিভাগসহ রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সব প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ দখলদারিত্ব ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। মোল্লাতন্ত্রে সেটা সম্ভব নয়; রাজতন্ত্রে তা আরো অসম্ভব। সমাজতন্ত্রে তা অকল্পনীয়।

আধুনিক গণতন্ত্র পুঁজিবাদের সৃষ্টি; পুঁজিবাদের বিকাশ এবং চরিত্রের উপর নির্ভর করে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় পুঁজিবাদ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মুখ্য ভূমিকা রেখেছে। সমাজ ও রাজনীতির বৈপ্লবিক রূপান্তরের নিয়ামক ছিলো পুঁজিবাদ। এটি পরিবর্তন আনতে সাহায্য করেছে সমাজের সর্বত্র; ভূস্বামী ও কৃষক থেকে চাকরিদাতা ও চাকরিজীবী তৈরি, অশিক্ষিত জনসমাজ থেকে শিক্ষিত পৌর সমাজ নির্মাণ, গ্রামভিত্তিক সমাজ থেকে আধুনিক শহুরে জনগণ এবং সম্পদ ও ক্ষমতা পরিকাঠামোকে কতিপয়ের একচ্ছত্র দখল থেকে মুক্ত করে জনগণের মধ্যে বিস্তৃত বন্টন (wider dispersion of resources)- সবকিছু পুঁজিবাদের পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ অবদান। আর এসবের সম্মিলিত প্রভাবে পুঁজিবাদ সৃষ্টি করে মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার তুলনামুলক ভারসাম্যপূর্ণ বন্টনের চাহিদা, যা অনিবার্যভাবে গণতন্ত্রকে দৃশ্যমান করে তোলে।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতা আশ্চর্য উৎকর্ষতার ‘পিরামিড’ নির্মাণ করলেও মধ্যবিত্তের বিনির্মাণ করতে পারেনি। হাম্মুরাবির ব্যাবিলন তো বটেই, মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক ইউরোপেও রাজনৈতিক প্রভাবশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণির উপস্থিতি নেই। মধ্যবিত্তের বিকাশ ম্যাক্স ভেবার কথিত পুঁজিবাদের গহবর থেকেই। বাণিজ্যিক কর্মকান্ড, শিক্ষার বিকাশ আর পুঁজিপতিদের অবাধ প্রতিযোগিতা জন্ম দিয়েছে মধ্যবিত্তের। সামন্ততান্ত্রিক যুগে গণ-সমাজে শিক্ষার বিকাশ ঘটেনি। কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থা ও সামাজিক গতিশীলতার অভাবে নগরায়ণের হার ছিলো খুবই সীমিত। সত্যিকার অর্থে শিল্প বিপ্লবের আগে বিশ্বের কোথাও গণ-মানুষের জীবন-জীবিকা বা জীবন মানের খুব বেশী কোন উন্নয়ন হয়নি। প্রতিনিয়ত তাদের মোকাবেলা করতে হয়েছে দুর্ভিক্ষ, প্লেগ, মহামারী। সন্দেহ নেই গত তিনশ’ বছরে সারা বিশ্বকে আমূল পাল্টে দিয়েছে পুঁজিবাদ। এ সময়ে যে উন্নয়ন হয়েছে তিরিশ হাজার বছরেও তা হয়নি। সুম্পিটার যথার্থ বলেছেন, ব্যক্তির উদ্ভাবনী শক্তিকে জাগ্রত করে পুঁজিবাদ বিজ্ঞানের প্রসারে নেতৃত্ব দিয়েছে। মুনাফার লোভ ব্যক্তির শ্রমঘণ্টা বাড়িয়েছে। জন্ম দিয়েছে নতুন সমাজ ব্যবস্থার, যার এক অবিচ্ছেদ্য উপ-ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ক্ষমতা চর্চার ধরন গণতন্ত্র। নিজের জন্ম, বিকাশের চাহিদা এবং বিনাশের আশঙ্কা দূর করতে গণতন্ত্র পুঁজিবাদকে সমর্থন করে। কেননা সমাজতন্ত্র বা একনায়কতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেবল উৎপাদন ব্যবস্থা কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের অধীনে আনতে চায় না, তা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনগণের পছন্দ ও রাজনৈতিক পদ দখলে অবাধ প্রতিযোগিতা নিয়ন্ত্রণ করে। ফলত গণতন্ত্রের অপমৃত্যু হতে বাধ্য পুঁজিবাদ ভিন্ন অন্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থায়।

অন্যদিকে, রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতির প্রতিটি ক্ষেত্র নির্মাণে গণমাধ্যম ভূমিকা রাখে এবং তা কোন নিরপেক্ষ বিষয় নয়। বিশ্বায়নের যুগে গণমাধ্যম মতাদর্শ বিনির্মাণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার। কেননা গণমাধ্যম সংস্কৃতির বিনির্মাণে কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করে। গণমাধ্যম আমাদের কাছে যা পেশ করে তা বাস্তব ও কল্পনার মেল বন্ধন। এই দুয়ের সমন্বয়ে গণমাধ্যম জনসমাজে পায় অপ্রতিরোধ্য প্রবেশ গম্যতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা। ফলত সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, রাজনৈতিক আদর্শ, রাজনৈতিক সংস্কৃতির বিনির্মাণ, সংরক্ষণ বা রূপান্তরে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আধুনিক যুগে শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্মতি আদায় হয় সংবাদপত্র আর টিভি নিউজের শিরোনামে। গণমাধ্যমের প্রচার রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে স্থিতিশীলতা দান করে, শাসন প্রক্রিয়ায় জনগণের সম্মতি আদায় হয়। গণমাধ্যম কোন সংস্থার ভাবমূর্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে, তাকে দৃঢ় করতে পারে, আবার তার বিরুদ্ধে গণমতও গড়ে তুলতে পারে। অন্যান্য উপরি কাঠামোর মত গণমাধ্যমও উৎপাদন ব্যবস্থার উপর (বেসিক স্ট্রাকচার) নির্ভরশীল, যা পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা-আদর্শ সৃষ্টির মাধ্যম। আন্তনিও গ্রামসীর অনুকরণে ফ্রেড ইনগ্লিস বলেন, স্কুল, চার্চ, রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংঘ, মিডিয়া ক্ষমতা কাঠামোর সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। এগুলো মনঃস্তাত্বিক আধিপত্য ও আদর্শ তৈরীতে কাজ করে।[৬৯] অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে গণমাধ্যম পুরোপুরি পুঁজিবাদের উপর নির্ভরশীল কেননা তা কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে পুরোপুরি ব্যক্তিমালিকানাধীন; পুঁজিবাদের বিকাশের উপর নির্ভর করে টেলিভিশন, রেডিও এবং সংবাদপত্রের জন্ম, বিকাশ এবং গণমাধ্যম কর্মীদের জীবন-জীবিকা। গণতন্ত্রের প্রতিও তাদের পক্ষপাতিত্ব টিকে থাকার জন্য কেননা অন্যান্য রাজনৈতিক মতাদর্শ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা বা মুক্ত মত প্রকাশের বিরোধী। ফলত নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গণমাধ্যম জনসমাজে তেমন গ্রহণযোগ্যতা পায়না এবং তার বিকাশ থাকে খুব সীমিত। সংগত কারণেই গণমাধ্যম অ-পুঁজিবাদী এবং অ-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরোধী। তাদের এই বিরোধিতা গণতন্ত্র-পুঁজিবাদের জোটবদ্ধতা এবং প্রসারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

আধুনিক সমাজে পুঁজিবাদ টিকে আছে উদ্ভাবনী ক্ষমতা, মেধার স্বীকৃতি আর সামাজিক-সাংস্কৃতিক গতিশীলতার কল্যাণে। বলপ্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ একটি হাতিয়ার হলেও পুঁজিবাদের মূল ভরসা উৎপাদন সম্পর্কের জালে সমস্ত সমাজকে আটকে ফেলা। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ব্যক্তির সম্মুখে অসংখ্য পদ, ব্যবসা, সম্পদ, সেবা উন্মুক্ত করে দিয়ে 'মায়ার জগত' তৈরি করে। ভোগবাদের সম্প্রসারণ ব্যক্তির চেতনা আচ্ছন্ন করে পুঁজিবাদের পক্ষেই তাঁর মনঃস্তত্ত্ব গড়ে দেয়। আর এ কারণেই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির পছন্দ গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ। অর্থনৈতিক কাঠামো ছাড়া স্বয়ম্ভু ক্ষমতা নিয়ে গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। বিকশিত পুঁজিবাদই গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ। কেননা গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ হিসাবে পরিগণিত বিষয়াবলি যেমন; গণমাধ্যম, সুশীল সমাজ, রাজনৈতিক সচেতনতা, ব্যাপক জন-অংশগ্রহণ, নাগরিক দায়বদ্ধতা, পৌর-সংস্কৃতি, দায়িত্বশীল আমলাতন্ত্র সবই পুঁজিবাদের অনুষঙ্গ। এ কারণেই গণতন্ত্রের প্রাণ-ভ্রমর হলো পুঁজিবাদ।

আবার পুঁজিবাদ স্বভাবগত ও উদ্ভবগত কারণেই গণতন্ত্রের পক্ষে। অন্য কোনো রাজনৈতিক মতবাদ গণতন্ত্রের মতো পুঁজিবাদকে সহায়তা করে না। গণতন্ত্র একদিকে বাজার ব্যবস্থাকে পুঁজিপতিদের হাতে ছেড়ে দেয় অন্যদিকে তাদের অবাধ সুযোগ/বৈধতা দেয় সম্পদ পুঞ্জীভূতকরণের, যা অন্য শাসন ব্যবস্থায় পদ্ধতিগতভাবে অসম্ভব। অনেকক্ষেত্রে সেসব মতবাদ (সমাজতন্ত্র, মৌলবাদ,

একনায়কতন্ত্র) পুঁজিবাদের স্বায়ত্ত্বশাসন উচ্ছেদ করে অর্থনীতিতে রাষ্ট্রের পূর্ণ কর্তৃত্ব আরোপের চেষ্টা চালায়; এমনকি পুঁজিপতিদের সম্পদ বাজেয়াপ্ত করে বা তাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করে সমাজে সাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায় (যেমন সোভিয়েত সমাজতন্ত্র বা জিম্বাবুয়েতে মুগাবের একনায়কতান্ত্রিক শাসন)। রাষ্ট্রে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ অন্যান্য রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে ঘটনাচক্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু সেক্ষেত্রে তাদের মধ্যে সর্বদা একটি টেনশন এবং অবিশ্বাস কাজ করে। পল কিগামীর মতে, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং চীনে পুঁজিবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্র বা অ-উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সমন্বয় রাষ্ট্র প্রশাসনে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অনিশ্চয়তার জন্ম দিয়েছে। বিপরীতে, গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদ একে অপরের সঙ্গে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে এবং রাষ্ট্রে একটি স্থিতিশীল আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থা দান করে। তারা এক-অপরের জীবন রক্ষাকারী বাতি বা ঢাল-বর্মের মতো কাজ করে। অবশ্যই তাদের মধ্যে আদর্শিক কোন সম্পর্ক নেই: বাস্তবিক ক্ষেত্রে তারা বিপরীতমুখী দর্শন ধারণ করে। গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদের সমন্বয়কে দৃঢ় করে তাদের বাঁচার তাগিদ (সারভাইবাল ডিমান্ড) এবং গণমাধ্যম; বস্তুত এই দুই ব্যবস্থার মঝে গণমাধ্যম একটি সেতু হিসেবে কাজ করে। গণমাধ্যম একদিকে অব্যাহত প্রচারের মাধ্যমে গণতন্ত্রকে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং উদার রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে জনমানসে প্রতিষ্ঠা করে অন্যদিকে এটি সমাজে ভোগের চাহিদার স্ফূরণ ঘটিয়ে পুঁজিবাদের বিকাশকে শক্তিশালী করে এবং অর্থনীতিতে পুঁজিপতিদের অটোনমি প্রতিষ্ঠা এবং তা বজায় রাখায় প্রহরীর ভূমিকা পালন করে।

তথ্যসূত্র

১ Joseph Schumpeter, *Capitalism, Socialism and Democr*acy (New York: Harper and Raw, 1946/1976), pp.82-83.

২ অ্যালমন্ড লিখেছেন: "capitalism is positively linked with democracy, shares its values and culture, and facilitates its developmentÓ. See, Gabriel Almond, "Capitalism and Democracy" , *PS: Political Science*, No.24, September 1991, p. 467.

৩ Robert A. Dhal, *On Democracy* (New Haven and London: Yale University Press, 1998), p. 4; Samuel Bowles, and Herbert Gintis, *Democracy and Capitalism: Property, Community, and the Contradictions of Modern Social Thought* (London: Routledge & Keagan Paul. 1986), p. 12.

৪ Joseph A. Maxwell, "Using qualitative methods for causal explanation", *Field Methods*, Issue 16, 2004, p.244.

৫ Himika Bhattacharya, "Interpretive research." In *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*, ed. L. M. Given (Thousand Oaks: Sage, 2008), p. 464.

৬ Joseph A. Maxwell, and Kavita Mittapalli, "Explanatory Research". In *The Sage encyclopedia of qualitative research methods,* ed. L. M. Given (Thousand Oaks: Sage, 2008), p. 323.

৭ John W. Creswell, and Vicki Plano-Clark, (2006). *Designing and conducting mixed methods research*. Sage.

৮ Maxwell, 2004, *op.cit*., p. 244; John Creswell, and Vicki Plano-Clark,, *op.cit*., p. 126.

৯ Joseph A. Maxwell and Kavita Mittapalli, 2008, *op.cit*., , p. 323.

১০ ম্যাক্স ভেবারের উদ্ধৃতি, Himika Bhattacharya, 2008, *op.cit.*, p.464.

১১ Larry Diamond, J. Linz and Martin Lipset, (eds.), *Democracy in Developing Countries: Africa (*Boulder: Lynne Reiner Pub, 1988).

১২ Robert A. Dhal, *Polyarchy: Participation and Opposition* (New Haven: Yale University Press, 1971), p. 34.

১৩ Guillermo O'Donnell, "Horizontal Accountability in New Democracies", *Journal of Democracy*, Vol. 9, no. 3 (July 1998), p.110.

১৪ Larry Diamond, *Developing Democracy: Toward Consolidation* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999), p. 3.

১৫ Seymour M. Lipset, ÒSome Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political LegitimacyÓ, *The American Political Science Review*, Vol. 53, No. 1, 1959, p. 71.

১৬ Friedrich A. Hayek, *The Road to Serfdom* (London: George Routledge and Son, 1974), p.73.

১৭ F. Bealey, "Capitalism and Democracy", *European Journal of Political Research*, Vol. 23, 1993, p. 205.

১৮ Robert A. Dhal, *On Democracy* (New Haven and London: Yale University Press, 1998), p. 167.

১৯ Joseph Schumpeter, 1976, *op.cit.*, pp.82-83.

20 Colin Seymour-Ure, *The Political Impact of Mass Media* (New-Delhi: Sage Publication,1974), p.15.

২১ Sidney Kraus and Richard M. Perloff, *Mass Media and Political Thought: An Information Processing Approach* (New Delhi: Sage Publication,1985), p. 198.

২২ Daniel Learner, *The Passing of Traditional Society: Modernizing of the Middle East,* (New York: Free-Press, 1958), p.54.

২৩ Benedict Anderson, *Imagined Communities* (London: Verso,1991), pp. 6-7.

২৪ বিপ্লবীদের তলোয়ার, গিলোটিন বা ফাঁসির দড়িতে প্রাণ হারান ইংল্যান্ডের রাজা প্রথম চার্লস (১৬৪৯), ফ্রান্সে ষোড়শ লুই (১৭৯৩), রাশিয়ায় জার শাসক নিকোলাস (১৯১৭)। কেবল রাজাদের প্রাণ হরণ নয়; লাখে লাখে স্বপ্নবাদী তরুণ প্রাণ দিয়েছে বিপ্লবের ডামাডোলে। বারম্যান ফরাসী বিপ্লবের প্রসঙ্গ টেনে বলেছেন, "vowing to eradicate democracy's enemies within as well as without, the new regime soon found itself at war both at home and abroad. In 1793 and 1794 came the Reign of Terror; historians estimate that 20,000 to 40,000 people were executed for "counterrevolutionary" activities (Berman, 2007: 32). Ó ‡`Lyb, Sheri Berman, "How Democracies Emerge: Lessons from Europe", *Journal of Democracy,* Vol. 18, No. 1, 2007, pp. 31-34.

২৫ সাধারণত দলের প্রভাবশালী কয়েকজন নেতা নিয়ে গঠিত হয় ক্যাবিনেট। তবে বর্তমানে সংসদীয় গণতন্ত্রে ক্যাবিনেটের বদলে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। এ বিষয়ে দেখুন, M. Gallagher, M. Laver, and P. Mair *Representative Government in Modern Europe* (New York: McGraw-Hill, 2004).

২৬ Almond, 19991, *op.cit*., p. 467.

২৭ Bealey, 1993, *op.cit*., p. 222.

২৮ Fareed Zakaria, *The Future of Freedom: Illiberal Democracy at Home and Abroad* **(**New York: W.W. Norton, 2003), p.69.

২৯ Shumpeter, 1946, *op.cit.*,p.125. ; Lipset, 1959, *op.cit*., p.71; Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* (Chicago: University of Chicago Press, 1981), p.5.

৩০ A. Downs, "An Economic Theory of Political Action in a Democracy", *The Journal of Political Economy*, Vol. 65, No.2, 1957, p. 139; Samuel Bowles and Herbert Gintis, *Democracy and Capitalism: Property, Community, and the Contradictions of Modern Social Thought* (London: Routledge & Keagan Paul. 1986), p.121.

৩১ A. Downs, 1957, *op.cit*., p. 140.

৩২ Dhal, 1998, *op.cit*., p, 165 ; Almond, 1991, op.cit., p. 468.

৩৩ Dhal, 1998, *op.cit*., p. 166.

৩৪ Seymour M. Lipset, *"*Reflections on Capitalism, Socialism and Democracy*", Journal of Democracy,* Vol. 4, No. 2, April 1993, p.50.

৩৫ G. M. Tamas, "Capitalism, Socialism, and Modernity", *Journal of Democracy,* Vol. 3, No.3, 1992, p.873.

৩৬ *Ibid*, pp.873-74.

৩৭ Robert A. Dhal, *Democracy and its Critics* (New haven: Yale University Press, 1989), p.5.

৩৮ Daniel Learner, *The Passing of Traditional Society: Modernizing of the Middle East,* (New York: Free-Press, 1958), p.32.

৩৯ ম্যাকলুহানের বিশ্লেষণে দেখা যায়, যোগাযোগের ইতিহাসে তিনটি মৌল উদ্ভাবনা মানুষের সমাজকে বদলে দিয়েছে। বর্ণমালা তৈরি করেছিল দৃষ্টিগোচর সংস্কৃতি। মুদ্রণ এর পরিসরকে বাড়িয়ে সূচনা করেছিল শিল্প বিপ্লবের। টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের ভিতর দিয়ে শুরু হয়েছিল তৃতীয় বিপ্লব এবং টেলিভিশন এর বর্ধিত রূপ। আধুনিক গণমাধ্যম বিশেষত টেলিভিশনই পৃথিবীকে পরিণত করেছে ' ভুবনব্যাপী গ্রামে'। এক্ষেত্রে ম্যাকলুহানের বহুল প্রচারিত বিবৃতিটি হলো: 'medium is the message'| we¯ÍwiZ, Marshall H. McLuhan, *Understanding Media: The Extension of Man* (New York: McGraw-Hill Book Company, 1964), pp.7-14.

৪০ Charles Lindblom, *Democracy and Market System* (Oslo: Norwegian University Press, 1988), p.17.

৪১ *Ibid*, p. 135.

৪২ Bowles and Gintis, 1986, *op.cit*., p. 17.

৪৩ Jerry Z. Muller, *"*Capitalism and Inequality: What the Right and the Left Get Wrong", *Foreign Affairs*, Vol. 92, 2013, p 32.

৪৪ "খেলাপি ঋণের পরিমাণ ১০ বছরে ৩ গুণ বেড়েছে: সিপিডি", দ্যা ডেইল স্টার (বাংলা), ঢাকা, শনিবার, ডিসেম্বর ১৭, ২০২২। (https://bangla.thedailystar.net/economy/news-430366)

৪৫ মহামন্দা মোকাবেলায় পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলো প্রায় ৬ ট্রিলিয়ন ডলার ব্যয় করে। ২০০৮ সালে মন্দা মোকাবেলায় কেবল যুক্তরাষ্ট্র ব্যয় করে ৭০০ বিলিয়ন ডলার। বাংলাদেশ সরকার এসময় পোশাক খাতসহ অন্যান্য রপ্তানী খাতে প্রায় ৫ হাজার কোটি টাকা প্রণোদনা সাহায্য দেয়। (http://en.wikipedia.org/wiki/Great_Recession_in_the_United_States)|

৪৬ Elizabeth Comack (ed.), *Locating Law: Race/Class/Gender Connections* (Halifax: Fernwood Publishing, 1999), chapter 3.

৪৭ Talal Asad, "Conscripts of Western Civilization." In *Civilization in Crisis*: *Anthropological Perspectives*. *Essays in Honor of Stanley Diamond*, ed. Christine Ward Gailey (Gainesville: University Press of Florida, 1992). Chapter 17.

৪৮ বিভিন্ন রাষ্ট্রে গণহত্যা এবং ক্যারিসমেটিক নেতাদের হত্যায় যুক্তরাষ্ট্রের সম্পৃক্ততার অভিযোগ বিষয়ক আলোচনার জন্য দেখুন, Christopher Hitchens, *The Trial of Henry Kissinger* (Washington, D.C.: Harper, 2001).

৪৯ Samuel P. Huntington, "Democracy's third wave", *Journal of Democracy*, Vol. 2, No. 2, 1991, p. 15.

৫০ Larry Diamond, "Why are There No Arab Democracies? *Journal of Democracy*, Vol. 21, No. 1, 2010, p. 93.

৫১ Joseph Schumpeter, 1946, *op.cit*., p.124.

৫২ *Ibid*, p.124.

৫৩ *Ibid*, p.125.

৫৪ Barrington Moore, *The Social Origins of Dictatorship and Democracy* (New York: Beacon Press, 1966), pp.159-162.

৫৫ Peter Berger, *The Capitalist Revolution* (New York: Basic Book, 1986), p.17.

৫৬ Francis Fukuyama, "Capitalism & Democracy: The Missing Link," *Journal of Democracy*, Vol. 3 (July 1992), p. 108.

৫৭ Lipset, 1959, *op.cit*., p. 75.

৫৮ Lipset, 1993, op.cit., p.44.

৫৯ Lipset, 1959, op.cit., p. 79.

৬০ Alex Inkels, and David Smith, Becoming Modern: Individual Change in Six Developing Countries (Cambridge: Harvard University Press,1974), p. 278.

৬১ Adam Przeworski, "Democracy and Economic Development". In Political Science and the Public Interest, eds., Edward D. Mansfield and Richard Sisson (Columbus: Ohio State University Press, 1991), p.5.

৬২ Ibid, p.9.

৬৩ Ibid, p.12

৬৪ Talal Asad, 1992, op.cit., ch. 17.

৬৫ নেপলিয়নের মতে, “Four hostile newspapers are more to be feared than a thousand bayonets”| D×„wZi Rb¨ †`Lyb, Susan Ratcliffe, Oxford Essential Quotations (Oxford: Oxford University Press, 2018), p. 87.

৬৬ Edward S. Herman and Noam Chomsky, Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media (Pantheon Books, NewYork, 1988), p. 306.

২৪ Almond and Powel, op cit., 1980, p.39

৬৭ Anderson, 1991, op.cit., p.15.

৬৮ এন্ডারসন জাতির পরিগঠন প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করেছেন এভাবে “a nation is imagined because the members of even the smallest nation will never know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of each lives the image of their communion [....] creation of imagined communities became possible because of print capitalism. Capitalist entrepreneurs printed their books and media in the vernacular in order to maximize circulation. As a result, readers speaking various local dialects became able to understand each other, and a common discourse emerged”. See Anderson, 1991, op.cit., pp. 6-7.

৬৯ Fred Inglis, Media Theory: An Introduction (Oxford: Oxford University Press, 1990), p.146.

জমা প্রদানের তারিখ : ০৮.০৫.২০২৩
গৃহীত হবার তারিখ : ২৭.১১.২০২৩